

নবমার্থসার

(প্রথম খণ্ড)



শাসনরক্ষিত মহাস্থবির

পরমার্থসার

(প্রথম খণ্ড)

তথ্যবুত্তাভিধম্মথা চতুধা পরমথতো,
চিত্তং চেতসিকং রূপং, নিক্কানমিতি সৰ্ব্বথা ।

শাসনরক্ষিত মহাস্থবির

উৎসর্গ

“সেই ধন্য নরকূলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।”

সর্বপ্রয়াত

পরম পুজ্যপাদ সপ্তম সংঘরাজ

উপধ্যায়-অভয়তিষ্য মহাহুবির,

পরম পুজ্যপাদ সাধকপ্রবর আৰ্য পুদ্গল

আচার্য - ধর্মবিহারী হুবির (সাধু ভক্ত),

পরমারাধ্যতমা মাতৃদেবী- বিধুমুখী বড়ুয়া,

পরমারাধ্যতম পিতৃদেব মাষ্টার নূতনচন্দ্র বড়ুয়া,

এবং পরম শিক্ষক ত্রিপিটক-কোবিদ

অধ্যাপক ডঃ মহেশ তেওয়ারী

(Prof. Dr. Mahesh Tewari)

নব নালন্দা মহা বিহার, নালন্দা,

বিহার, ভারত ।

নব নালন্দা মহাবিহারে অধ্যয়নকালে (১৯৬৩-

১৯৬৬ ইং) ছাত্র বাৎসল্যে যিনি আমাদের বিনয়,
সূত্র, অভিধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন।

তাদের সদৃশতা ও নির্বাণ কামনায় এই দার্শনিক গ্রন্থখানি কৃতজ্ঞ চিন্তে উৎসর্গ করা হল।

শাসনরক্ষিত মহাহুবির।

পরমার্থসার (প্রথম খণ্ড)	:	ডঃ শাসনরক্ষিত মহাশ্ববির
সম্পাদক	:	শ্রী মিহির কান্তি বড়ুয়া, এম.এ.
	:	শ্রী পীযুষ কান্তি বড়ুয়া, বিদর্শন-আচার্য
প্রকাশক	:	শ্রী সুমেধ বড়ুয়া ও তাঁর সহধর্মিনী অরুনা বড়ুয়া ফতুল্লা, নরায়ণগঞ্জ
প্রচারনায়	:	নূতনচন্দ্র বিদর্শন ভাবনা প্রচার কেন্দ্র দক্ষিণ ঢাকাখালী (আবুরখীল) গুজরা (বি.ও) রাউজান, চট্টগ্রাম
প্রথম প্রকাশ	:	ভাদ্র পূর্ণিমা (মধু পূর্ণিমা), ৫ই আশ্বিন ২৫৪৬ বুদ্ধাব্দ, ২০শে সেপ্টেম্বর ২০০২ খ্রষ্টাব্দ, ১৪০৯ বাংলা, ১৩৬৫ মঘাব্দ।
শ্রদ্ধাদান	:	৩০.০০ (ত্রিশ টাকা মাত্র)।

শুভেচ্ছা

ডঃ শাসনরক্ষিত মহাহুঁবির সংকলিত ‘পরমার্থসার’ পুস্তকের পান্ডুলিপি পাঠ করে সবিশেষ আনন্দিত হলাম। তিনি একজন বিদর্শন সাধক এবং দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজে শিক্ষাকতাও করেছেন। সেদিক থেকে অভিধর্মে তাঁর ব্যুৎপত্তি আছে। ইতিপূর্বে বাংলাভাষায় অভিধর্মার্থ সংগ্রহের উপর কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এরূপ অনুবাদকদের মধ্যে ডাক্তার শ্রীরামচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি, শ্রীলানন্দ ব্রহ্মচারী, সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া অন্যতম। এতদসঙ্গেও গম্ভীর অভিধর্মের বিষয় সাধারণ পাঠকের কাছে এখনও দুর্বোধ্য। এদিক দিয়ে তিনি অভিধর্মের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো তুলনামূলকভাবে সহজ ভাষায় ও চিত্তাকর্ষকরূপে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। পুস্তকটি নির্ভুলভাবে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হলে পালি বিষয়ে বি.এ. (সম্মান), এম. এ. ও এম, ফিল্ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। ডঃ মহাহুঁবিরের এই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তিনি ভবিষ্যতে এরূপ আরও মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করে সদ্ধর্মের হিতসাধনে রত থাকবেন বলে আমি মনে করি।

তারিখঃ ৩০-০৬-৯৮)
(মৃত্যু : ৩০-০৮-৯৮ ইং)
মনিপুর, মিরপুর-১
ঢাকা, বাংলাদেশ।

ইতি
নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রী শশাংক বিমল বড়ুয়া
ট্রিপিটক পাঠক,
বাংলাদেশ বেতার,
ঢাকা, বাংলাদেশ।

সম্পাদকের মন্তব্য

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্মৈ

মরণশীল জগতে কে বেঁচে থাকতে না চায়; সকলেই চায়। কেউ মরে যেতে চায় না। সকলেই অমর হয়ে থাকতে চায়। কিন্তু তা কি সম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করতে মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। মানুষ বিভিন্নভাবে বেঁচে থাকতে চায়। কেহ কেহ নব নব আবিষ্কারের মাধ্যমে, কেহ কেহ অভিযানের মাধ্যমে, কেহ কেহ নিজের কাজের মাধ্যমে। আবার কেহ কেহ লেখনীর মাধ্যমে।

লেখা একটি শিল্পকর্ম। শুধু লেখা নয়, পড়াও শিল্পকর্মের অন্তর্গত। ভগবান বুদ্ধভাষিত “মঙ্গলসূত্র” এ বর্ণিত যে সকল শিল্পে [বাহুসচ্চক্ষু, সিদ্ধক্ষু, বিনয়ো চ সুসিক্ষিতো..... এতং মঙ্গলমুত্তমং] উত্তম মঙ্গল আনয়ন করে, তন্মধ্যে লেখা-পড়া অন্যতম। লেখা-পড়া শুধু বর্তমানে প্রচলিত আছে তা নয়, বুদ্ধযুগেও তা প্রচলিত ছিল। তক্ষশীলা বিদ্যাপীঠ এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কর্ম হচ্ছে কাজ। কাজ দুপ্রকার। যথা,- সংকাজ এবং অসং কাজ। সংকাজ হচ্ছে কুশলকর্ম। অসংকাজ হচ্ছে অকুশলকর্ম। কুশলকর্ম হচ্ছে যেগুলো নিজ ও পরের মঙ্গল আনয়ন করে; এবং অকুশলকর্ম হচ্ছে যেগুলো নিজ এবং অপরের অমঙ্গল বয়ে আনে। কুশালকুশল কর্ম নানাবিধ। ভগবান বুদ্ধ তাঁর ৪৫ বৎসর ধর্মদেশনায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সেগুলো ত্রিপিটকে লিপিবদ্ধ আছে।

যা মঙ্গল তা-ই কুশল। “মঙ্গলসূত্র” এ বর্ণিত ৩৮ প্রকার মঙ্গলই কুশল। দানাদি যেমন কুশলকর্ম, তেমনি লেখা-পড়াও কুশলকর্ম। তাই অনেকে কুশলকামী হয়ে ত্রিপিটকের অংশ বা সারাংশ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এতে তাঁরা মৃত্যুর পর স্বর্গগামী হয়ে থাকেন। তদুপরি তাঁরা নির্বাণের হেতু উৎপন্ন করেন। তা ছাড়াও তাঁরা পরের উপকার করে থাকেন। পরোপকার মৈত্রী। যাঁরা মৈত্রী ভাবনা করেন তাঁরা ব্রহ্মলোক পরায়ণ। শুধু যে তাঁরা ধর্মীয় পুস্তক লিখেন তা নয়, তাঁরা ধর্মীয় পুস্তক পাঠও করেন। প্রত্যহ বুদ্ধ বন্দনা, ধর্ম বন্দনা, সংঘ বন্দনাদি করা যেমন কুশল কর্ম তেমনি ত্রিপিটকের অন্তর্গত ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করাও কুশলকর্ম। শুধু পাঠ করা নয়, শ্রদ্ধাসহকারে ব্যবহার করাও কুশল কর্ম। তাই প্রাত্যহিক বুদ্ধ বন্দনাদির সাথে ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করা একান্তই কর্তব্য। শুধু পাঠ নয়, বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে বুদ্ধবাণী (ত্রিপিটক) আনুষ্ঠানিক ভাবে পূজা করা উচিত। দেখা যায় যাঁরা গুরু নানকের অনুসারী (বিশেষতঃ শিখ সম্প্রদায়), তাঁরা গুরু নানকের বাণীসমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে “গ্রন্থসাহেব” নামে পূজা করেন, অর্চনা করেন। যা হোক, ধর্মীয় পুস্তক পাঠে কুশল কি, অকুশল কি, তা জানা যায়। কুশলাকুশল জেনে উৎপন্ন অকুশলকে বর্জন করে,

অনুপন্ন অকুশলকে উৎপন্ন হতে দেয় না, অনুপন্ন কুশলের উৎপত্তির চেষ্টা করে এবং উৎপন্ন কুশলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। একে আর্থ অষ্টাঙ্গিক মাণের সম্যক প্রধান বলে।

ভগবান বুদ্ধ ছিলেন সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন। তিনি তাঁর ধর্মদেশনায় অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি জগতে এমন কোন নীতি নেই যা তিনি বলেননি। এগুলো ত্রিপিটক পাঠে সবিশেষ জানা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ধর্মীয় পুস্তক পাঠে অনভ্যস্ত বলে এসকল নীতি থেকে অনেক দূরে সরে যেয়ে আমাদের অবক্ষয় নিজেরাই ডেকে আনছি। পুঞ্জীয় ভক্ত সমাজের অবক্ষয় রোধে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। তিনি শিশু, কিশোর, বয়স্ক নির্বিশেষে বিহার ভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তা করা না হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে বৌদ্ধ সমাজ অতলে তলিয়ে যাবে। নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই তিনি তাঁর প্রবন্ধগুলোতে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন।

প্রবন্ধ ছাড়াও সমাজের মঙ্গলার্থে তিনি ‘আর্যপথ’ নামে একটি পুস্তিকা লিখেছেন। এটাতে বিশেষ করে সমালোচনা স্থান পেয়েছে। সেটাতে তিনি ‘বুদ্ধবিহার’কে ‘বৌদ্ধমন্দির’ এবং ‘বুদ্ধধর্ম’কে ‘বৌদ্ধধর্ম’ বলার কোন যুক্তি খুঁজে পাননি। সবিশেষ জানতে হলে ‘আর্যপথ’ পড়ুন। উপকৃত হবেন।

ইতিপূর্বে তিনি বি.এ. (সম্মান), এম.এ. পর্বের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ‘ভাষাতত্ত্বসার’ নামক পুস্তকটি লিখেছেন। তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানের (Comparative Philology) উপর এমন সুন্দর বই বিরল। সাহায্যকারী পুস্তক হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। ইদানিং তিনি তাঁর সন্দর্ভটি (Thesis) পুস্তকাকারে ‘Householders’ discipline (A critical study of householders’ discipline in Theravāda Buddhism)’ নামে বের করেছেন। গৃহীবিনয় সংঘর্ষে বহু ধর্মীয় পুস্তক লিখিত হলেও এমন ধারাবাহিক বিষয় এককভাবে স্মরণকালে লিখিত হয়নি। পুস্তকটি বাংলায় হলে সর্বসাধারণের সবিশেষ উপকারে আসত। কিন্তু ইংরেজীতে হওয়াতে মুষ্টিমেয় লোকেরাই উপকৃত হবে।

বর্তমানে তিনি অভিধর্মের উপর ‘পরমার্থসার’ নামে একটি পুস্তক লিখেছেন। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে ডাক্তার শ্রীরামচন্দ্র বড়ুয়া, শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া প্রমুখ অনেকেই পুস্তক লিখেছেন। প্রকৃতপক্ষে অভিধর্মের বিষয় গম্ভীর, দুর্দানুবোধ্য। এতদসত্ত্বেও তিনি সাধারণ পাঠকের জন্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো তুলনামূলকভাবে সরল ভাষায় এবং চিত্তাকর্ষকরূপে তুলে ধরেছেন। এটা লেখকের কৃতিত্ব বলা চলে। বি.এ. (সম্মান), এম.এ. এম. ফিল ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যকারী পুস্তকরূপে উপকারে এলে লেখক কৃতার্থ হবেন মনে করি।

পরিশেষে বলতে চাই অভিধর্মে জ্ঞানার্জন ব্যতীত কেহ বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না। অভিধর্ম পাঠে আত্ম পরিচয় মিলে। আত্মোপলব্ধি হয়। যাকে আমরা ব্যবহারিকবশে ‘আমি’

বলি অভিধর্মের দিক থেকে “আমি” নামক কোন সত্ত্বা নেই। চিত্ত, চৈতসিক ও রূপের সমন্বয়ে গঠিত “নামরূপ”ই ব্যবহারিকবেশে “আমি” নামক সত্ত্বা। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই চার প্রকার অরূপস্বক্কেই নাম। ২৮ প্রকার রূপই রূপস্বক্কে। বেদনা, সংজ্ঞা প্রত্যেকে এক একটি চৈতসিক। বাকী ৫০ প্রকার চৈতসিকই সংস্কার নামে খ্যাত। এতে দেখা যায় চিত্ত, চৈতসিক, রূপই অভিধর্মের বিষয় এবং শমথ/বিদর্শন ভাবনার অনুশীলনে নামরূপের সম্যক পরিচয়ে নির্বাণ অধিগত হয় অর্থে নির্বাণও অভিধর্মে স্থান পেয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি অভিধর্মের বিষয় হল চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ - এই চারপ্রকার পরমার্থ ধর্ম।

পুনঃ বিদর্শনাচার্য ডঃ শাসনরক্ষিত মহাস্থবির বিরচিত গম্ভীর ও দুরানুবোধ্য অভিধর্ম বিষয়ক ‘পরমার্থসার’- সংকলনে সম্পাদকের দায়িত্ব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কতটুকু কাজ করতে পেরেছি জানি না। কারণ যাদের সংসর্গে ও সংস্পর্শে এসে নিজে ধর্মীয় চেতনায় উজ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছি তাঁদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান প্রাণপুরুষ সদ্ধর্মপ্রাণ বিদর্শন সাধক যশস্বী পিতা প্রয়াত নূতনচন্দ্র বড়ুয়া মাষ্টার। আমার শৈশবেই দেখেছি তাঁর ধর্মীয় জীবন যাপন প্রণালী ও সাধনা যা আমাদের বড়ই অনুপ্রাণিত করেছে। তারপরে যার নাম স্মরণ করতে হয় তিনি এই গ্রন্থপ্রণেতা শ্রদ্ধাভাজন ডঃ ভক্তে। তাঁর যৌবনের প্রারম্ভেই স্বপ্নাদিত হয়েই সুদূর বার্মাদেশে (বর্তমান মায়ানমার) গেলেন বিদর্শন ভাবনায় শিক্ষা নিতে। সংগে নিলেন নিজ পিতাকে আর স্বগ্রামবাসী কাকা প্রয়াত ইন্দুভূষণ বড়ুয়াকে। সুদীর্ঘকাল সেখানে সকলে বিদর্শন ভাবনা শিক্ষা করে ফিরে এলেন নিজ দেশে। বাবা তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ বিহারে (বর্তমান নূতনচন্দ্র বিদর্শনারাম) কোন গুরু ছাড়াই কঠোর ধ্যানানুশীলন করে নির্বাণগামী হলেন। এই দিকে গ্রন্থপ্রণেতা নিজে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে উপসম্পদা গ্রহণ করে বেছে নিলেন পুরোপুরি ধর্মীয় জীবন। তারপর কলেজে অধ্যাপনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। দেশে দেশে ধর্মদেশনা, ধর্মচর্চা, বিদর্শনভাবনা-চর্চা সর্বোপরি বিদর্শন আচার্য হিসাবে স্বগ্রামে নিজ প্রতিষ্ঠিত নূতনচন্দ্র বিদর্শন ভাবনা প্রচার কেন্দ্রে দফে দফে শতাধিক ধর্মপ্রাণ নারী, পুরুষকে বিদর্শন ভাবনা শিক্ষাদান। নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় প্রতিষ্ঠিত করলেন ডঃ শাসনরক্ষিত বুদ্ধ-বিহার ও ভাবনা প্রচার কেন্দ্র। একই সাথে অর্জন করলেন ডক্টরেট ডিগ্রী ভারত হতে। তারপরের ব্যক্তিত্বকেও পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। বাংলাদেশ বেতারের ত্রিপিটক পাঠক হলেও বিভিন্ন ধর্মসভার ধর্মালোচনায় তিনি শ্রোতাদের কাছে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছেন একজন বিচিত্র ধর্মকথিক রূপে। তিনি হলেন আমার বড় ভাই প্রয়াত শশাংক বিমল বড়ুয়া। এরা সকলেই আমার পরম শ্রদ্ধাভাজনে ও কল্যাণমিত্র। তাঁদের সকলের ধর্মজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হয়েই যতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি তা অতীব ক্ষীণ ও স্বল্পই বলতে হয়। এহেন স্বল্প জ্ঞানীর পক্ষে একজন জ্ঞানী পুরুষের অভিধর্ম বিষয়ক বিষয়াবলীর উপর তেমন কোন মন্তব্য করা ধৃষ্টতার সামিল। চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ বিষয় সমূহকে প্রত্নকার যেভাবে সহজ ও সরলভাবে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করেছেন - আমি মনে করি তা সকলের বোধগম্য হবে। যদিও বা কথায় বলে -সহজ কথাও বলা যায় না সহজে। -এই রকম গম্ভীর বিষয়কে তিনি যে সহজভাবে বলতে পেরেছেন -কারণ তিনি তত্ত্বজ্ঞানী, ধ্যানী ও সুপণ্ডিত বিধায় সম্ভব হয়েছে।

সে যাই হোক এই গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে আমার উপরোক্ত মন্তব্য ছাড়াও কিছু বানান, শব্দ ও বাক্য বিন্যাস সংশোধন করেই আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি মাত্র। শত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটতে পারে কিংবা ছাপযন্ত্রের কারণেও কিছু ভুল সংযোজিত হতে পারে। তজ্জন্য সহৃদয় পাঠক সমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের কাছে আমি দুঃখিত। নিজ জ্ঞানে ভুল সংশোধন করতঃ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে এর মমার্থ উপলব্ধি করণে সবিশেষ মনোযোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ করি।

পরিশেষে অনুরোধ করব - নিজ নিজ জ্ঞানময় চিন্তা বিস্তৃত করে সবিশেষ মনোযোগ সহকারে গ্রন্থখানি পাঠ করতে পারলে চিন্তা, চৈতন্য, রূপ ও নির্বাণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতঃ স্ব স্ব নির্বাণের হেতু উৎপন্ন করতে সক্ষম হবেন।

পাঠকসমাজের কাছে বিনম্র শ্রদ্ধা, প্রণাম, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে মৈত্রীপূর্ণ চিন্তে সকল প্রাণীর পরম সুখ কামনা করছি।

ইতি:-

শ্রী পীযুষ কান্তি বড়ুয়া

শ্রী মিহির কান্তি বড়ুয়া

প্রকাশকের কথা

বুদ্ধধর্ম যেভাবে অবক্ষয় হতে চলছে তাতে বুঝা যায় আগামী ১০ বছরে বুদ্ধধর্মাবলম্বীরা আরো বেশী অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হবে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে অনেকে বিভিন্ন ভাবে উত্তর দিয়ে থাকেন। এই অবক্ষয়ের শেষ কোথায় প্রশ্নে বৌদ্ধ সমাজের সুশীল ব্যক্তি যারা আছেন তাঁরাও এর উত্তর এড়িয়ে যান। অথচ সারা পৃথিবীতে হিসেব করলে দেখা যায় বুদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তার পরেও বুদ্ধধর্মের অবক্ষয় কেন? এভাবে হাজারো প্রশ্ন এসে যায়। সমাধান আমরা কেউ দিতে পারি না। আবার একটু পিছনের দিকে তাকালে তা আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারি। দু'একটা উদাহরণ দিলে হয়ত ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১। এই উপমহাদেশে একদিন যে ভগবান বুদ্ধের দেদীপ্যমান শাসন ছিল তার প্রমাণ কুমিল্লার শালবন বিহারের পোড়া মাটির নিদর্শন এবং রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর বুদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। এভাবে আরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেক কিছুর প্রমাণ আমাদেরকে আবেগপ্রবণ করে তোলে। ২। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় একসময় বুদ্ধধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগুরু ছিল কিন্তু আজ তাঁরা সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করছে। ৩। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম একটি বুদ্ধমূর্তি ২০০১ সালেই 'তালেবানিরা' করেছে ধ্বংস। সারা বিশ্ব প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু 'তালেবানি' সরকার তাতে কোন কর্পপাত করেনি। অবশ্য ইতিমধ্যে 'তালেবানি' শাসন ২০০১ সালে শেষ হয়েছে। ৪। শ্রীলঙ্কায় 'আদম চূড়ার' মত বিরল একটি বৌদ্ধ ঐতিহ্য আছে। এই আদম চূড়ায় আছে ভগবান বুদ্ধের পদচিহ্ন।

‘পরমার্থসার’ নামক এই ধর্মগ্রন্থের প্রকাশক হিসেবে আমি প্রথমে বন্দনা জানাই পূজনীয় লেখক ডঃ শাসনরক্ষিত মহান্থবির, বিদর্শনাচার্যকে। তিনি আরো বহু ধর্মগ্রন্থ লিখেছেন। তার মধ্যে গত বৈশাখী পূর্ণিমায় (২৫শে মে, ২০০২ ইংরেজী) ওনার ‘Householders’ Discipline (A critical study of householders’ discipline in Theravāda Buddhism) নামে একখানি ইংরেজী ধর্মগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আমি মনে করি এরকম ইংরেজী ধর্মগ্রন্থ এত সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। অবশ্য লেখক এইগ্রন্থটি দেশ বিদেশের সকল বুদ্ধধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রকাশ করছেন। তিনি অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। আমি মনে করি সকল বুদ্ধধর্মাবলম্বীরা তাঁর রচিত প্রবন্ধাদিসহ এইগ্রন্থগুলো পড়লে ও মনন করলে আমাদের দেশে বুদ্ধধর্মের অবক্ষয় নিরুদ্ধ হবে। অভিধর্মগ্রন্থ আরো অনেকে রচনা করেছেন কিন্তু আমার বিশ্বাস অভিধর্মের বিষয়াবলী এত সুন্দর ব্যাখ্যা করে আর কেউ রচনা করতে পারেনি। এই গ্রন্থে তিনি পাঁচটি ভাগে যথা,- ভূমিকা, পরমার্থ ধর্ম, চৈতন্য, রূপধর্ম এবং নির্বাণ এর উপর পৃথক পৃথকভাবে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা পড়লে আমরা পরমার্থ জ্ঞানের অধিকারী হতে পারব।

পরমার্থজ্ঞান লাভের জন্য আমি প্রত্যেক বুদ্ধধর্মাবলম্বীদের সবিনয় অনুরোধ করব আপনারা পরিবার পরিজন নিয়ে প্রত্যহ বুদ্ধ বন্দনাদি করুন। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শমথ/বিদর্শন ভাবনা অভ্যাস করুন। এতে আপনার ও আপনার পরিবারের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হবে না।

এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কথা বলতে চাই। আমার পরম করুণাময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা ছিলেন বুদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ উপাসক ও ধর্মানুরাগী। তাঁরা আমাকে বুদ্ধধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন ও ধর্মীয় জীবন যাপনে উৎসাহিত করতেন। তাঁদের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে আমি নিজে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে বন্দনা করি। পঞ্চশীলাদি পালন করি। আমাকে অনুসরণ করে আমার স্ত্রী, পুত্র এমনকি আমার ৩য় বৎসরের স্নেহময়ী কন্যা জয়শ্রীও প্রত্যহ বুদ্ধাদি ত্রিরত্নে বন্দনা করে থাকে। আমি মনে করি এর দ্বারা পারিবারিক জীবনে স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে সুখে আছি। আমি আজ বিদর্শনাচার্য ডঃ শাসনরক্ষিত মহাহুঁবির বিরচিত ‘পরমার্থসার ১ম খণ্ড’ প্রচারে প্রকাশকের ভূমিকা পালন করার তথা বুদ্ধধর্ম প্রচারের সুযোগ পেয়েছি। এই পুণ্যের প্রভাবে আমাদের নির্বাচনের হেতু হোক।

এই মহতীকাজে আমার সহধর্মিণী অরুণা বড়ুয়ার বাচনিক উৎসাহ, পুত্র জয় ও কন্যা জয়শ্রীর নীরব ও বিরক্তমুক্ত সহযোগিতা এই গ্রন্থ প্রকাশ সহজতর হয়েছে। আমার দ্বারা কৃত এই পুণ্যকাজের পুণ্যাংশ তাদের সর্বপ্রকার হিতার্থে সম্প্রদান করছি।

ধম্মদানং সৰ্ব্ব দানং জিনাতি। সৰ্ব্বৈ সন্তা সুখিতা ভবন্ত।

ইতি

সুমোধ বড়ুয়া।

পরমার্থসার

(প্রথম খণ্ড)

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা
১-২১

ভূমিকা :

বিনয় পিটক

সূত্র পিটক

অভিধর্ম পিটক

অভিধর্মের অর্থ কি ?

অভিধর্মের উৎপত্তি

অভিধর্মের বিষয়বস্তু

বিশ্বজগত এবং এর পরিচালনা

অনাত্মবাদ : নৈতিক এবং দার্শনিক পটভূমি

ভাল (ন্যায়) এবং মন্দের (অন্যায়ের) সমস্যা

ভারতীয় দর্শনের মতবাদসমূহ এবং সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

বৌদ্ধ ঐতিহ্য

জৈন ঐতিহ্য

কর্ম এবং পুনর্জন্ম

সত্ত্বগুণের (দৈহিক ও মানসিক) প্রকৃতিতে

কর্মের প্রভাব

বৌদ্ধ যোগ

ত্রিবিধ নিমিত্ত

ত্রিবিধ ভাবনা

অভিঞ্ঞা (অভিজ্ঞা)

প্রথম অধ্যায় :

পরমার্থ ধর্ম

চিন্তা

অশোভন চিন্তা

অহেতুক চিন্তা

২২-৩৮

শোভন চিত্ত
বিপাক চিত্ত
ক্রিয়া চিত্ত
রূপাবচর চিত্ত
অরূপাবচর চিত্ত
লোকোত্তর চিত্ত

দ্বিতীয় অধ্যায় :	ঐতসিক	৩৯-৪১
তৃতীয় অধ্যায় :	রূপধর্ম পরমাণুর লক্ষণ ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের আকার এবং গঠন ইন্দ্রিয়ের শক্তি ইন্দ্রিয়সমূহের উত্তরকারী লক্ষণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় মন বা বিজ্ঞান চিত্ত বিপ্রযুক্ত ধর্ম (সংস্কার) অসংস্কৃতি ধর্ম	৪২-৫২
চতুর্থ অধ্যায় :	নির্বাণ অভিধর্ম পাঠে খেরবাদ এবং বৈভাষিক এর মধ্যে সামঞ্জস্য এবং অসামঞ্জস্য বিষয়গুলো জেনে রাখা ভাল	৫৩-৫৬

পরমার্থসার ভূমিকা

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নকে বন্দনা করে পরমার্থ সারকথা শুরু করছি।
বুদ্ধবাণী (যা বুদ্ধের ধর্মকায় বা বাজ্যীয়ী মূর্তিরূপে বিবেচিত হয়) তিন
ভাগে বা তিনটি পিটকে বিভক্ত। যথা,- (১) বিনয় পিটক, (২) সূত্র পিটক, (৩) অভিধর্ম
পিটক।

বিনয় পিটক :

বিনয়ের সাধারণ অর্থ নিয়ম। এই নিয়মের (বিনয়) দ্বারা মন সংযত হয়। বিনয় পিটক
ভিক্ষুসংঘের একান্তভাবে প্রতিপালনীয় শীল বা নীতি গ্রন্থ নামে কথিত হয়।

বিনয় পিটক পাঁচখন্ডে বিভক্ত : যথা,- মহাবগ্গ, চুল্লবগ্গ, পারাজিক, পাচিত্তিয়, পরিবার।
(পালি পাবলিকেশন বোর্ড, বিহার সরকার-১৯৬০)

সূত্র পিটক :

সূত্র পিটকে বুদ্ধদেশিত উপদেশ ভিক্ষু, গৃহী উভয় সম্প্রদায়েরই প্রতিপালনীয় বিষয়। এটি
বুদ্ধ শাসনের ধর্মবশে ব্যবহারিক দেশনা। এই পিটকে অভিধর্ম সংমিশ্রিত থাকাতে একে
ধর্মও বলা হয়ে থাকে। সূত্র পিটক নিকায়ভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত : যথা,- দীঘনিকায়,
মজ্ঝিমনিকায়, সংযুত্তনিকায়, অঙ্গুত্তরনিকায়, খুদ্ধকনিকায়। খুদ্ধক নিকায় আবার পঞ্চদশ
উপ-বিভাগে বিভক্ত : যথা,- খুদ্ধক পাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত,
বিমানবথু, পেতবথু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেশ, পটিসম্বিদামগ্গ, অপদান,
বুদ্ধবংস, চরিয়াপিটক।

অভিধর্ম পিটক:

অভিধর্ম পিটক অতিশয় গম্ভীর দার্শনিক তত্ত্ব। এটি সাধারণ মানুষের বোধশক্তির অতীত
বলে ভগবান বুদ্ধ তা তাবতিংস স্বর্গের দেবগণের নিকট মাতা মহামায়ার উপস্থিতিতে প্রথম

দেশনা করেছিলেন। এতে জটিল মনস্তত্ত্ব, মনোদর্শন ও ধ্যানের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অভিধর্ম পিটক সাতখণ্ডে বিভক্ত : যথা,-ধম্মসঙ্গণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা পুগ্গলপঞ্জ্ঞপ্তি, কথাবথু, যমক, পট্টান।

অতি সংক্ষিপ্তভাবে বুদ্ধবাণীর পরিচয় দেওয়া হল। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় অভিধর্ম।

আমরা অভিধর্ম-দর্শন প্রধানতঃ চারটি প্রধান শিরোনামে অধ্যয়ন করতে পারি। যথা,- অভিধর্মের অর্থ কি, অভিধর্মের উৎপত্তি, অভিধর্মের বিষয়বস্তু, এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

অভিধর্মের অর্থ কি?

অভিধর্মের অর্থ বিষয়ে আমরা নিম্নলিখিত সত্যসমূহ উপস্থিত করতে পারি।

অভিধর্ম দুটি শব্দের দ্বারা গঠিত হয়েছে। অভি ও ধর্ম (ধম্ম); অভি + ধর্ম(ধম্ম) = অভিধর্ম (অভিধম্ম)। ‘অভি’ উপসর্গ দ্বারা বুঝায় (কিছু) অধিকতর, চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত, অতিক্রান্ত, উচ্চতর। ‘ধর্ম’ শব্দটির দ্বারা সেই বিষয় সমূহই [রূপ ও অরূপ, পঞ্চিন্দ্রিয় ও মনিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় এবং নির্বাণ(লোকোত্তর বিষয়)] বুঝায় যেগুলো সমগ্র জগতকে (বিশ্বজগত) ব্যাখ্যা করার জন্য বুদ্ধদর্শনে গৃহীত হয়েছে। এরূপে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি অভিধর্ম হল সমগ্র জগতকে ব্যাখ্যা করার জন্য ভগবানের (লোকবিদ, সম্যকসম্বুদ্ধ) উৎকৃষ্ট শিক্ষাসমূহের নাম।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে। ভগবান বুদ্ধ যখন ৪৫ বৎসর ধরে ধর্মীয় পর্যটনে (ধর্ম প্রচারে) রাত ছিলেন তখন তিনি ধর্মীয় নীতি বিষয়ক বিভিন্ন বিবৃতি (দেশনা) দিয়েছেন। বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত এই সমস্ত দেশনা (বিবৃতি) ভগবানেরই বচন। তা হলে কিভাবে একটি সাধারণ এবং অন্য একটি উৎকৃষ্ট বিবেচিত হতে পারে। যদিও এটা অস্বীকার করা যেতে পারে না যে সমগ্র দেশনাই *Ip sisma verba* (ভগবৎ বাক্য) তবুও আমরা তাদিগকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারি এবং সেহেতু তাদিগকে লোকপ্রিয়, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অসাধারণ এবং উৎকৃষ্ট হিসেবে নামকরণ করতে পারি। আচার্য বুদ্ধঘোষ অর্থশালিনীর [অট্টশালিনী-ধর্মসঙ্গণির অর্থকথা (অট্টকথা)] প্রারম্ভে এই বিষয়ে আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর অভিমত হচ্ছেঃ

বিনয় পিটকে ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রতিপাল্য অনেক নিয়ম-কানুন (শীল) আছে। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে 'এই করিও, 'এই করিও না' বহু উপদেশ দিয়েছেন। এজন্য এই উপদেশসমূহকে (বিনয় পিটকে) আণা দেশনা বা আজ্ঞা দেশনা বলে।

সূত্র পিটকে ব্যবহারিক উপদেশ আছে যেগুলো শ্রোতা ও উপলক্ষের উপযোগী করে প্রদত্ত হয়েছে। এজন্য এগুলো বোহার দেশনা (বিবিধ প্রকারের ব্যবহারিক উপদেশ) নামে কথিত হয়।

অভিধর্ম পিটকে সকল দার্শনিক সমস্যা আলোচিত হয়েছে। উপলক্ষ কিংবা শ্রোতা-দর্শক সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কিন্তু চরম (পরম) বাস্তবতা (ও লক্ষ) সম্পর্কে সরাসরি প্রশ্নসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। পুজ্ঞানুপুজ্ঞরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে এবং পরিপূর্ণরূপে আলোচিত হয়েছে। এই কারণে অভিধর্মকে পরমার্থ দেশনা বলা হয়।

এরূপে অভিধর্মের উপদেশসমূহ (শিক্ষাসমূহ) উৎকৃষ্ট উপদেশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

আচার্য বুদ্ধঘোষ কর্তৃক ইহা সঠিকভাবে মন্তব্যকৃত হয়েছে যে, অভিধর্ম হল - ধম্মাতিরেক - ধম্মাবিসেসট্ঠেন অভিধম্মো'তি-ধর্মাতিরিক্ত ধর্মবিশেষার্থে অভিধর্ম।

অন্যান্য দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও ইহা উৎকৃষ্ট হতে পারে। ব্যবহারে (পরীক্ষা, বিভাজন, বিশ্লেষণ) পদ্ধতির দিক দিয়েও ইহা অন্য পিটকদ্বয়কে (বিনয় পিটক ও সূত্র পিটক) অতিক্রম করে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যমতে একটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত হয় যখন ইহা তিন প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়। যথা,- (১) সুত্ত ভাজনীয়, (২) অভিধম্ম ভাজনীয়, (৩) পঞ্হ পুচছক নয়। বিনয় এবং সূত্রে কেবল একটি পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু অভিধর্মে তিনটির সবকয়টি পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়েছে। কেবল কয়েকটি অধ্যায়ে ব্যতিক্রম করা হয়েছে যেগুলোতে পঞ্হ পুচছক নয় ব্যবহার করা হয়নি। এরূপে বিষয়বস্তু বিবেচনার (পদ্ধতির) দিক দিয়ে চিন্তা করলেও ইহা উৎকৃষ্ট বলে বোধ হয়।

অভিধর্মের উৎপত্তি

অভিধর্মের উৎপত্তির দিক দিয়ে আরেকটি প্রশ্ন উঠতে পারে। ধর্মীয় পর্যটনের সময় ভগবান বুদ্ধ সকলের নিকট তাঁর উপদেশ বাণী প্রচার করেছেন; এবং সূত্র ও অভিধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। তা হলে কিভাবে অভিধর্মকে পৃথক করা হয় এবং উৎকৃষ্ট শিক্ষা হিসেবে আমাদের হাতে অর্পণ করা হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষের মতে এই সমস্ত প্রশ্নের একটি ঐতিহ্যগত উত্তর আছে।

কথিত আছে ভগবান বুদ্ধ জনসাধারণের নিকট গভীরত্বের কারণে অভিধর্ম দেশনা করেননি। তিনি অভিধর্মের উপর উপদেশ বাণীসমূহ তাবতিংস ভবনে তাঁর মাতাকে উপলক্ষ করে দেশনা করেছেন। উল্লেখিত আছে তাঁর মাতা মহামায়া মৃত্যুর পর তুষিত ভবনে দেবপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। দেশনার সময় তিনি (মাতা) দেবীরূপে তাবতিংস ভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে বুদ্ধ দেবগণের সভায় উপবিষ্ট হয়ে অভিধর্ম দেশনা করেছিলেন।

বুদ্ধের সেই দেশনা কোন বিরতি ছাড়াই তিন মাস ধরে চলেছিল। আরও বর্ণিত আছে ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষান্ন সংগ্রহের (ভোজনের) বেলা লক্ষ করে তিনি সেই সভায় নিজের একটি প্রতিমূর্তি ঋদ্ধি বলে তৈরী করতেন। এবং একই ধারায় সেই প্রতিমূর্তি দ্বারা ধর্মদেশনা করাতেন। কেহ বুঝতে পারতেন না কে ধর্ম দেশনা করেছেন। তিনি নিজে জম্বুদ্বীপে (ভারত) চলে যেতেন। কেননা তিনি ছিলেন মনুষ্য। মনুষ্য আহারই ছিল তাঁর উপযুক্ত। সারীপুত্র স্থবির প্রদত্ত দত্তকাষ্ঠে দত্ত মর্জন করে ভগবান বুদ্ধ অনবতপ্ত হ্রদে মুখ প্রক্ষালন করতেন, স্নান করতেন এবং উত্তরকুরু থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতেন। পুনরায় ভিক্ষান্নসহ তিনি সেই হ্রদের তীরে ফিরে যেতেন। ভোজন সমাপনান্তে তিনি সেই হ্রদে হাত ও মুখ ধৌত করতেন এবং নিকটবর্তী চন্দন বনে দিবাবিহার করতেন। ধর্ম সেনাপতি সারীপুত্র স্থবির তথায় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর (বুদ্ধের) সেবা করতেন।

ভগবান বুদ্ধ সেই দিবস পর্যন্ত স্বর্গে দেশিত সমস্ত অভিধর্মের শিক্ষা (উপদেশসমূহ) ধর্ম সেনাপতির নিকট দেশনা করতেন। ভগবানের প্রস্থানের পর সারীপুত্র স্থবির তাঁর পাঁচশত ভিক্ষুপরিষদে যেতেন এবং তাঁদের নিকট সেই উপদেশসমূহ পুনরায় দেশনা করতেন। সেই পাঁচশত ভিক্ষু আবার সেগুলো তাঁদের শিষ্যদের। এক্রূপে অভিধর্ম অবিচ্ছিন্নভাবে আচার্য এবং শিষ্য পরম্পরায় আমাদের হাতে এসেছে। এটাই বুদ্ধ ও তাঁর সাক্ষাত শিষ্যগণ কর্তৃক অভিধর্ম দেশনার ঐতিহ্যগত বর্ণনা।

অভিধর্মের বিষয়বস্তুঃ

ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য পদ্ধতির (System) মতই অভিধর্ম-দর্শনও দুঃখ ও দুঃখ নিরোধের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত। বুদ্ধ বলেছেন, চতুসচচং বিনিমুত্তো ধম্মো নাম নথি। অর্থাৎ চতুরার্য সত্য ব্যতীত অপর কোন ধর্ম নেই। বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত তাঁর উপদেশ বাণীর মূল বক্তব্য হচ্ছে দুঃখের স্বরূপ এবং সেই দুঃখের নিরোধ বা নির্বাণ; এবং দুঃখ নিরোধাগামী প্রতিপদা আর্থ্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া। এই উদ্দেশ্য ইহা সকলের নিকট পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ দুঃখে আছে। তাদের তা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। ইহা আকাংখিত যে আমরা সেই দুঃখ দূরীকরণের কার্যধারা [পদ্ধতি] যতক্ষণ বুঝব না ততক্ষণ আমরা সেই দুঃখের প্রকৃতি এবং এর কারণ উপলব্ধি করব না।

ইহা বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে অবিদ্যার (মোহের) কারণে মানুষ জাগতিক বিষয়সমূহের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি করে এবং ঐ সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারে (কারণে) সে যে অপ্রীতিকর অনুভূতি অনুভব করে তাকে বুদ্ধ দুঃখরূপে আখ্যায়িত করেন। স্পষ্টত, পটিকুলং বেদনীয়ং দুঃখং (প্রতিকূল অনুভূতিই দুঃখ)। এই প্রসঙ্গে আরেকটি সমস্যা সৃষ্টি হয়। সে কে? দুঃখ কে (কি)? উত্তর অতি পরিষ্কার। সে একজন মানুষ। এই মানুষটি কি? ইহা আরেকটি সমস্যা। এজন্য একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব (ব্যক্তিগত অস্তিত্ব) সম্বন্ধে যখন অনুসন্ধান করি তখন আমরা এতে দুটি জিনিষ দেখতে পাই। প্রথমতঃ স্থূল বস্তুগত বিষয়, যেমন চুল, নখ, অস্থি, মাংস, রক্ত ইত্যাদি। এগুলো ব্যতীত আরেকটি দিক আছে - যা দ্বারা চিন্তা করা হয়। অভিধর্মে ব্যক্তিত্বের এই সমস্ত বিষয়ের দুটি পারিভাষিক নাম আছে। স্থূল বস্তুগত বিষয়কে রূপ বলা হয় এবং চিন্তার বিষয়টিকে নাম বলা হয়। এর মধ্যে একটি অংশ 'রূপ' বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং এই কারণে বোঝা বেশ সহজ। অন্য অংশটি 'নাম' রূপে অভিহিত হয়। ইহা সুক্ষ্ম (দূর্বোধ্য) এবং এই কারণে ব্যাখ্যার দাবী রাখে (প্রয়োজন হয়)। আমরা কোন জিনিষের (বিষয়ের) উপস্থিতি ছাড়াই সেই বিষয়ে চিন্তা করতে পারি।

চিন্তা হল তা - যা কোন জিনিষ (আলম্বন - জড় ও অজড়) সম্বন্ধে চিন্তা করে। এই চিন্তন যে কোন প্রকারের হতে পারে। যথা,- আমি বৃদ্ধ, সে বৃদ্ধ, আমাকে শিক্ষা দিন ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকারের চিন্তাকে চিন্তা নামে অভিহিত করা হয়। 'আমার পাঠ করা উচিত' এক প্রকারের চিন্তা এবং এই কারণে ইহা একটি চিন্তা। 'ইহা একটি সুন্দর বই' ইহা আরেক প্রকারের চিন্তা এবং সেহেতু ইহা এক প্রকারের চিন্তা। অতএব আমাদের ব্যক্তিত্বের চিন্তার যন্ত্র বা দিকটি চিন্তা নামে অভিহিত হতে পারে।

এই চিন্তাও একটি স্বাধীন অস্তিত্ব নয়। ইহা আরো অনেক উপকরণ (চিন্তবৃত্তি) সমবায়ে গঠিত যেগুলো চৈতন্যিক বা চিন্তবৃত্তি উপকরণ নামে কথিত হয়। যখন আমি আমাকে বলি, একজন শিক্ষককে শিক্ষা দেওয়া যাক, তখন একটি চিন্তা উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই চিন্তা একটি দীর্ঘ ধারায় (সত্ততি = প্রবাহ = (Process)) উৎপন্ন হয়। সর্বপ্রথম দরিদ্র লোকটি (শিক্ষক) চক্ষুপথে আগমন করে। অনুভূতি ইন্দ্রিয় (স্পর্শ-ইন্দ্রিয়) ও গরিব লোকটির মধ্যে একটি স্পর্শ (সম্মিলন) হয়। তারপর একটি অনুভূতি (বেদনা) সৃষ্টি হয়। তারপর সেই আলম্বন সম্বন্ধে একটি প্রাথমিক জ্ঞান (সংজ্ঞা) উৎপন্ন হয়। এর পর উপলব্ধ হয়, শিক্ষা দেওয়া একটি ভাল জিনিষ (শুভকর্ম, পুণ্যকর্ম) এবং শুভকর্ম (ভবিষ্যতে) আরো ভাল ফল আনয়ন করে (বিজ্ঞান = চিন্তা)। স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, করুণা জাঘ্রত হওয়া ইত্যাদি হল উপকরণ যেগুলো চেতনা = চিন্তা উৎপন্ন সাহায্য করে। তাদের কার্যের ঐরূপ প্রকৃতির জন্য সেগুলো চৈতন্যিক নামে অভিহিত হয়। অতএব ব্যক্তিত্বের চিন্তার দিকটি চৈতন্যিকসমূহের সমাহার ছাড়া আর কিছু নয়। সেজন্য আমরা বলতে পারি, একজন মানুষ চিন্তা, চৈতন্যিক ও রূপের সমাহারের (সংমিশ্রণ) সমন্বয়। মানুষ দুঃখে (মগ্ন) আছে। সে কিভাবে মুক্ত হবে? দুঃখ মানুষের (নিজ) সৃষ্ট আসক্তিসমূহের কারণে উৎপন্ন হয়। সুতরাং মুক্তি বা স্বাধীনতার

অবস্থা বোঝায় আসক্তিসমূহের অনুপস্থিতি এবং এরূপে আকাঙ্ক্ষায় (ইচ্ছা, কামনা-বাসনা, তৃষ্ণা)নিরপেক্ষ হওয়া বা অনাসক্তিই হল সেই অবস্থা যা নির্বাণ নামে কথিত হয়।

সূতরাং অভিধর্ম হল চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণ যা দুঃখ থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করে। এভাবে একজন মানুষ বলতে চিত্ত, চৈতসিক এবং রূপকে বোঝায় যার লক্ষ্য হচ্ছে দুঃখমুক্তি (নির্বাণ)। উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে এটাই জ্ঞাত হওয়া যায় যে, যা আমাদের অভ্যন্তরে, যা আমাদের বাহিরে (চার পাশে) এবং যা আমাদের লক্ষ্য - এই চিত্ত, চৈতসিক, রূপ এবং নির্বাণই হচ্ছে অভিধর্মের বিষয়বস্তু।

বিশ্বজগত এবং এর পরিচালনাঃ

এই বিশ্বজগত হচ্ছে একটি প্রহেলিকা। অতীতে বিভিন্ন মুনি-ঋষিগণ এই জগতের প্রকৃতিকে জানতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বর্তমানেও চেষ্টা করছেন, কিন্তু অতীতেও তাঁরা এই জগতের সঠিক (যথাযথ) প্রকৃতি জানতে পারেননি। বর্তমানেও তা একটি প্রহেলিকা। জগতের সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত না হওয়া সত্ত্বেও জগতের পরিচালনা (ব্যবস্থাপনা) সম্বন্ধে অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে। আমরা নিম্নলিখিতভাবে তাদের সংক্ষিপ্তসার করতে পারিঃ-

বৈদিক ঐতিহ্যমতে দার্শনিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে এই জগত ঈশ্বরের (ব্রহ্মার) সৃষ্টি। তিনি প্রতিপালনও করেন। এই জগতের ধ্বংসও তাঁর ইচ্ছানুসারে হয়ে থাকে। তিনি চিন্তা করলেন যে, একটি জগত সৃষ্টি হোক এবং জগতের আবির্ভাব হয়ে গেল। পুনরায় তিনি চিন্তা করলেন জগতের বিনাশ সাধিত হোক এবং জগতটি বিলীন হয়ে গেল। এরূপে ব্রহ্মার (মহাব্রহ্মার) ইচ্ছানুসারে এই জগতের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ সাধিত হয়। এই মতবাদে পরম (চরম) শক্তি হল ব্রহ্ম অথবা পুরুষ অথবা ঈশ্বর।

ফুল, ফল, বৃষ্টি, শীত, উষ্ণ (গ্রীষ্ম), পর্বত, নদী, পাখি, পশু প্রভৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছার ফসল। সূতরাং ঈশ্বর এই জগত পরিচালনার জন্য দায়ী।

আরেকটি দর্শন আছে যাকে চার্বাক বলা হয়। এই মতে আসল সার পদার্থ হল পঞ্চ মহাভূত। তারা হল ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ, তেজ, মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম (আকাশ)। এই মহাভূতগুলোর সংযোগের জন্য আমরা এই জগতের বিভিন্ন বস্তু দেখতে পাই। যেমন, - সবুজ পানপাতা, সাদা চুন, তামাটে সুপারি যখন একত্র করা হয় তখন একটি নতুন বর্ণের জন্ম দেয়, যা হল লাল। অনুরূপভাবে এই মহাভূতগুলো যখন একত্রে সম্মিলিত হয় তখন তারা বিভিন্নরূপে দেখা দেয়; কুসুম প্রস্ফুটিত হওয়া, ফলের আগমন, আবহাওয়ায় পরিবর্তন ইত্যাদি সবগুলো হল এই সমস্ত মহাভূতের বিভিন্ন প্রকারে সম্মিলিত হওয়ার

কারণে সৃষ্ট। একরূপে চার্বাক কোন শক্তি ছাড়াই এই জগতের পরিচালনের মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন।

বুদ্ধদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। আবার এই কথা বলে না এই জগত কারও দ্বারা শাসিত হয় না। বরঞ্চ বলে, এই জগতের বিন্যাস (arrangement) কর্ম আইনের কারণে সংঘটিত হয়। একজন মানুষ বিভিন্ন ধরনের কাজ করে। সে এর দ্বারা সেই কাজের সংস্কার বা বিপাক সৃষ্টি করে। এই সংস্কারগুলো প্রবৃত্তি, ঝোঁক বা প্রবণতা বা তৃষ্ণা উৎপন্ন করে, যা ভবের কারণ হয়। বিভিন্ন রূপে সত্ত্বগুণের সৃষ্টি কর্ম আইনের কারণে।

এখন এই প্রশ্ন উঠতে পারে কর্ম আইন কিভাবে কাজ করে। ব্যাপক অর্থে আমরা বলতে পারি কর্ম আইন নির্ভরশীল উৎপত্তি (dependent origination) পারিভাষিক ভাষায় 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি' অনুযায়ী কাজ করে।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার; সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান; বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নামরূপ; নামরূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তন; ষড়ায়তনের প্রত্যয়ে স্পর্শ; স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনা; বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণা; তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপদান; উপদানের প্রত্যয়ে ভব; ভবের প্রত্যয়ে জন্ম; জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন দুঃখ-দৌর্মন্সন্য-নৈরাশ্য উৎপন্ন হয়। একরূপে সমগ্র দুঃখরাশি উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রতীত্য সমুৎপাদ-নীতি।

অনাত্মবাদ (The Theory of non-soul): নৈতিক এবং দার্শনিক পটভূমি

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার তিনটি ঐতিহ্য আছে, যেমন,- বৈদিক ঐতিহ্য, জৈন ঐতিহ্য এবং বৌদ্ধ ঐতিহ্য। বৈদিক ঐতিহ্য মতে, সকল অস্তিত্বের (being) ব্যক্তিত্বে একটি শাস্ত্র আত্মা আছে যা অপরিবর্তনশীল। তা সুকর্মের ফল ভোগ করে না, মন্দ কর্মেরও না। এটি মানুষের শরীরের ভিতর অবস্থান করে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এর সাথে অসংলগ্ন (unattended) থাকে। অনুরূপভাবে জৈন দর্শনও বিশ্বাস করে একটি আত্মা আছে কিন্তু তা শাস্ত্রতও বটে, আবার অশাস্ত্রতও বটে, যেমন বিভিন্ন প্রকারের অলংকার যথা, আংটি, মালা, বালা, মল ইত্যাদি স্বর্গে তৈরি, কিন্তু সকল সময় স্বর্গ একই। অতএব সার পদার্থ যখন ধরা হয়, তখন আত্মা শাস্ত্রত কিন্তু আকৃতি (প্রকার) যখন ধরা হয়, তখন আত্মা অশাস্ত্রত।

বুদ্ধ এই ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, কোন আত্ম থাকতে পারে না। আমরা যদি ধরে নেই একটি আত্মা আছে, তা হলে কোন পবিত্র জীবন থাকতে পারে না। নীতিশাস্ত্রের নীতিমালা হল আচার- আচরণের নীতিমালা।

দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হল চরম (পরম) সত্য (বাস্তবতা)। যখন আমরা বিশ্বাস করি সবার উপরে একটি আত্মা আছে, তা হলে নৈতিক চেষ্টাবলী (কার্যাবলী) তুচ্ছ, অসার, নিরর্থক হয়ে পড়ে। আমরা শীলের শিক্ষাপদসমূহ (নীতি সমূহ) পালন করি এবং ধ্যান অভ্যাস করি উচ্চতর সাফল্য (অবস্থা) প্রাপ্তির জন্য। আত্মা তার শাস্ত্রত প্রকৃতির জন্য ভাল কর্মের ফল পেতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সকল ধর্মীয় কার্যকলাপই নিরর্থক হয়ে পড়ে। সুতরাং নৈতিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। ইহা মুক্তির সমস্যাসমূহেও প্রভাবান্বিত করে। যেহেতু আত্মা শাস্ত্রত, এটি (অস্তিত্বের) খারাপ অবস্থায় যেতে পারে না এবং পাল্টাপাল্টি (সোজা বিপরীত)। মানুষ বন্ধনে আবদ্ধ থাকে যখন সে বন্ধনে থাকে। সে মুক্তও থাকবে যখন সে মুক্ত। দুঃখ হতে মুক্তির কোন সম্ভাবনা থাকবে না। এজন্যই ভগবান বুদ্ধ আত্মা মতবাদ (ধারণা) খণ্ডন করেছেন।

ভাল (ন্যায়) এবং মন্দের (অন্যায়ের) সমস্যা

ভারত এবং ভারতের বাহিরের সকল দার্শনিক মতবাদের সম্মুখে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হল এর বিচার করা, ভাল কি, ন্যায় কি এবং মন্দ কি, অন্যায় কি। এমন কি অনেক চেষ্টার পর তাঁরা ইহা বিচার অথবা নির্দিষ্ট করতে সমর্থ হননি ভাল এবং মন্দের বিচারের মাপকাঠি কি হবে? বাস্তব জীবনেও আমরা এটা কঠিন বোধ করি ভাল এবং মন্দ বুঝতে এবং তাদের পার্থক্য নিরূপণ করতে। একজন ছাত্রের কাছে যা ভাল (ন্যায়), একজন কৃষকের কাছে তা মন্দ (অন্যায়) হতে পারে। অন্যদিকে একজন কৃষকের কাছে যা সঠিক তা একজন ছাত্রের কাছে মন্দ হতে পারে। শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষকের বক্তব্য মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা এবং বাড়ির কাজ গুরুত্বের সঙ্গে সম্পাদন করা একজন ছাত্রের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী কর্তব্য হতে পারে কিন্তু একজন কৃষকের জন্য তা ক্ষতিকর হতে পারে। আমরা বিলম্ব না করে মন্তব্য করে ফেলি চুরি করা অন্যায় কিন্তু চোরটি যদি জৈব দ্রব্যসমূহ গরিব এবং অভাবী ব্যক্তিদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়, (তখন) এটি পাপ কাজ বলে বোধ হয় না। অনুরূপভাবে একজন ভিক্ষুকে ভিক্ষাদান একটি পুণ্য কাজ কিন্তু উপাসক (দায়ক) যদি দানীয় বস্তুসমূহ একজন নির্দোষ ভ্রমণকারীর নিকট হতে লুট করে নেয় তখন এটি মন্দ হয়। এখন আমরা কিভাবে বলতে পারি এই হয় ভাল, এই হয় মন্দ। এই প্রহেলিকা আমাদের পারিবারিক জীবনেও বর্তমান থাকে।

খাদ্য গ্রহণ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু একজন রোগীর নিকট তা ক্ষতিকারক হতে পারে। ভাল এবং মন্দের এই উভয়সংকট প্রাচীন চিন্তাবিদদের দ্বারা বিভিন্নভাবে

মীমাংসিত হয়েছে। বৈদিক ঐতিহ্যে মানুষের জীবনধারার একটি ছক (পদ্ধতি) দেওয়া হয়েছে।

একটি জীবনে চারটি স্তর (ভাগ) আছে। ঐ ঐতিহ্য মতে মানুষ একশত বৎসর বেঁচে থাকার কথা। এই একশত বৎসর সময় চারটি স্তরে (আশ্রমে) বিভাগ করা হয়েছে, প্রত্যেকটি ২৫ বৎসর ধরে। প্রথম ২৫ বৎসর বয়সকে পারিভাষিক ভাষায় ব্রহ্মচর্য বলা হয়।

এই সময়ে মানুষকে আচার্য্যের কাছে যেতে হয় এবং সকল বিদ্যা ও শিল্প (হাতের কাজ, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি) শিক্ষা করতে হয়। বিদ্যা শিক্ষা সমাপনান্তে তাকে গৃহস্থ জীবনের (পারিবারিক জীবনের) উপযুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়।

তারপর দ্বিতীয় স্তর (আশ্রম) শুরু হয়। এ স্তর ২৬ হতে ৫০ বৎসর পর্যন্ত চলে। একে পারিভাষিক ভাষায় গৃহস্থাশ্রম বলা হয়। এই সময়ে মানুষকে তার পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তানদের প্রতি তার সকল কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। সে পরিবার প্রতিপালন করার জন্য ধনার্জন করে এবং সম্পত্তি সঞ্চয় করে। এই সময়ে তাকে উত্তরাধিকারীদের জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলো বিশেষ কর্তব্য পালন করতে হয়।

তারপর আসে পাঁচিশ বৎসর ব্যাপী তৃতীয় আশ্রম, ৫১ বৎসর হতে ৭৫ বৎসর পর্যন্ত। এই সময়ে মানুষ শিক্ষা করে সংসারে বাস করেও কিভাবে সংসার হতে বৈরাগ্য ভাব জাগ্রত করতে হয়। এর দ্বারা এই বুঝায় যে, সে সেই সমস্ত কার্যকলাপ অভ্যাস করে যা কি না তার আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক। একে বলা হয় বানপ্রস্থ। এই সময়েও মানুষের জন্য নির্দিষ্ট অনেক কর্তব্য আছে।

তারপর শুরু হয় শেষ স্তর ৭৬ হতে ১০০ বৎসর পর্যন্ত। এই সময় মানুষ গৃহস্থ জীবন ত্যাগ করে বনে গমন করে এবং নিজেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনায় উৎসর্গ করে। এই সময়ের জন্য স্পষ্টভাবে উল্লিখিত অনেক কর্তব্যও আছে।

এখন ভাল কি এবং মন্দ কি? মানুষের জন্য ব্যবস্থাপিত প্রত্যেক স্তরের কাজ ঠিকমত করাই ভাল এবং সেই গুলিকে অবহেলা করাই মন্দ। প্রত্যেক স্তরের (আশ্রমের) জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি সম্পাদন করার পরই ভাল এবং মন্দ বিচার হবে। ভাল হতে মন্দ পৃথক করার (ভাল, মন্দ বিচার করার) আরেকটি উপায়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। এও কথিত হয়ে থাকে যে, প্রত্যেক কাজের উপায় এবং লক্ষ্য আছে। যদি উপায় এবং লক্ষ্য উভয়েই ভাল তখন কাজটি ভাল বলে বিবেচিত হয়। উপায় মন্দ এবং লক্ষ্য ভাল অথবা লক্ষ্য মন্দ এবং উপায় ভাল, কাজটিও মন্দ হবে।

ভগবান বুদ্ধ ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি চাননি যে, তাঁর অনুসারীদের মনোযোগ অনুরূপ সমস্যায় শেষ হয়ে তাতে নিবদ্ধ থাকুক। তিনি কুশল ও অকুশল “হেতু” দ্বারা ভাল এবং মন্দ বিচার করার একটি সরাসরি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এরূপে যেই কার্যের মূলে আছে কুশল হেতু তা ভাল এবং যেটির মূলে আছে অকুশল হেতু তা মন্দ। ৬টি হেতু আছে। ৩টি কুশল এবং ৩টি অকুশল। এরূপে ৬টি হেতু। কুশল হেতু হল অলোভ, অদ্বेष ও অমোহ। অকুশল হেতু হল লোভ, দ্বেষ ও মোহ। আরও তিনটি হেতু আছে যেগুলি কুশলও নয়, অকুশলও নয়। এরূপে একজনকে ভাল এবং মন্দ বিচার করার পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। যে এরূপ নির্ধারণ করে তাকে বিজ্ঞ ব্যক্তি বলা যায়।

ভারতীয় দর্শনের মতবাদসমূহ এবং সংক্ষিপ্ত ভূমিকা :

ভারতে প্রথম এবং প্রধান সাহিত্য হল বেদ। বেদসমূহ সংখ্যায় চারটি। যথা,- ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদ। এই চারটি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ হল সবচেয়ে প্রাচীন।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহে বেদকে “চতুর্বেদ” বলা হয় না, “ত্রিবেদ” বলা হয়। বুদ্ধের সময় পর্যন্ত অথর্বকে বেদের অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি। মনে হয় পরে আরও অনেক কিছু যোগ করে “ত্রিবেদ” কে “চতুর্বেদ” করা হয়েছে।

বেদসমূহে আমরা বিভিন্ন দেবতার প্রতি প্রার্থনা দেখতে পাই। তাদের মধ্যে দর্শনের বীজ দেখা যায়। বেদে যেই দর্শন দৃষ্ট হয় তা খুব স্পষ্ট বলে মনে হয় না। যা হোক, ঋষিগণ প্রকৃতিকে দর্শন করেছেন এবং তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। অতএব সেখানে (বেদে) সৃষ্ট মতবাদসমূহ (সূত্রসমূহ) নেহাতই কল্পনা প্রসূত (Speculative)।

উপনিষদে দার্শনিক মতবাদসমূহ বা সূত্রসমূহ স্পষ্ট করা হয়েছে কিন্তু সেখানেও আমরা তার সুশৃঙ্খল একটা বিকাশ (প্রকাশ) লক্ষ্য করি না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (Schools) দর্শনের বিকাশ আমরা পরবর্তীতে লক্ষ্য করি। সেই বিকাশ আমরা বিভিন্ন ভাগে অধ্যয়ন (আলোচনা) করতে পারি (১) বৈদিক ঐতিহ্যে দর্শন সম্প্রদায়, (২) বৌদ্ধ ঐতিহ্যে দর্শন সম্প্রদায়, (৩) জৈন ঐতিহ্যে দর্শন সম্প্রদায়।

বৈদিক ঐতিহ্যে ছয়টি দার্শনিক সম্প্রদায় আছে। যথা,- বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, যোগ, বৈশেষিক এবং সাংখ্য। বৌদ্ধ ঐতিহ্যে প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায় হল খেরবাদ বুদ্ধধর্ম। এ ছাড়া আরও চারটি দার্শনিক সম্প্রদায় আছে। সেগুলো হল- সর্বাতিবাদ, সৌত্রান্ত্রিক, মাধ্যমিক এবং যোগাচার। মাধ্যমিক সম্প্রদায় শূন্যবাদ বলে কথিত হয়। যোগাচার সম্প্রদায় বিজ্ঞানবাদ বলে কথিত হয়। এরূপে বৌদ্ধ ঐতিহ্যে সর্বমোট পাঁচটি দার্শনিক

সম্প্রদায় আছে। জৈন ঐতিহ্যে তিনটি সম্প্রদায় আছে। তাদের মধ্যে দিগম্বর সম্প্রদায় ও শ্বেতম্বর সম্প্রদায় হল গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায়। তৃতীয় সম্প্রদায়টি হল তের পন্থ। এরূপে দর্শনের এই তিনটি শাখা ভারতে অতীতে বিকাশ লাভ করেছিল এবং বর্তমান অবধি তাই চলছে।

(১) **বৈদিক ঐতিহ্য :** ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে যে, ভারতীয় দর্শনের বৈদিক ঐতিহ্যে ছয়টি পদ্ধতি আছে। আসুন, আমরা তাদের প্রচারিত কিছু প্রধান দার্শনিক মতবাদ অবগত হই।

(ক) **বেদান্ত :** এই পদ্ধতির দার্শনিক মতবাদ অনুসারে শেষ চরম, পরম বাস্তবতা হল ব্রহ্ম। তিনিই সত্য এবং জগত হল সম্পূর্ণ মিথ্যা। ব্রহ্মের ইচ্ছানুসারে সবকিছু সংঘটিত হয়। মায়ায় কারণে আমরা এই পৃথিবীকে বিভিন্নরূপে দেখি।

(খ) **ন্যায় :** তর্ক শাস্ত্র পদ্ধতিতে ষোলটি বাস্তবতা আছে। এই পদ্ধতির মতে মানুষ এই ষোলটি বাস্তবতায় পরিপূর্ণ জ্ঞানের মাধ্যমে অজ্ঞতা দূর করতে পারে এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করে। যখন সে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করে তখন সে বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে থাকে।

(গ) **মীমাংসা :** এই পদ্ধতির একটি অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী আছে। এ বলে যে, মুক্তি অর্জন করা সম্ভব বিভিন্ন (ধর্মীয়) পূজা ও আচার অনুষ্ঠানের (Rites and Rituals) মাধ্যমে, তাও যজ্ঞ কর্মের দ্বারা। অতএব মীমাংসায় অনেক যজ্ঞ কর্মের বর্ণনা আছে।

(ঘ) **যোগ :** দর্শনের এই পদ্ধতি ব্যবস্থা দেয় যে, মনের স্থায়ী শান্তি দৈহিক ও মানসিক অনুশীলনের (উন্নতির) মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অতএব এটা কিছু শারীরিক ব্যায়াম এবং সমাধি (ধ্যানের) ব্যবস্থা দিয়ে থাকে।

(ঙ) **বৈশেষিক :** এই মতবাদ সপ্ত ধর্ম যা পারিভাষিক ভাষায় সপ্ত পদার্থ নামে অভিহিত। কথিত হয়ে থাকে যে, যখন মানুষ এই সপ্ত পদার্থ অনুধাবন করে তখন সে মুক্ত হয়ে থাকে।

(চ) **সাংখ্য :** দর্শনের এই পদ্ধতির মতে দুটি তত্ত্ব আছে। একটি পুরুষ নামে কথিত হয় এবং অন্যটি প্রকৃতি নামে বর্ণিত হয়। এও কথিত হয় যে, পুরুষ হল সার্বজনীন ও সচেতন। প্রকৃতি হল অসচেতন।

কথিত হয়ে থাকে যে, পুরুষ হল শেষ বাস্তবতা। পুরুষের ইচ্ছানুসারে প্রকৃতি কাজ করে। অতএব একজন হল কেবল দর্শকমাত্র এবং অন্যটি অভিনেতা। এই দুই বাস্তবতার সহযোগিতার ফলে পৃথিবী চালিত হয়।

বৌদ্ধ ঐতিহ্য :

খেরবাদ বুদ্ধধর্মে চারটি সত্য (পরমার্থ বিষয়) আছে যথা,- চিত্ত, চৈতসিক, রূপ এবং নির্বাণ। চিত্ত, চৈতসিক ও রূপ আমাদের ভিতরে যা আছে এবং আমাদের বাইরে যা আছে তা নিয়ে অধ্যয়ন (আলোচনা) করে। নির্বাণের আলোচ্য বিষয় হল পরম সত্য অর্থাৎ আমরা যা লাভের জন্য চেষ্টা (সাধনা) করি অথবা যা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত পরমার্থ লক্ষ্য। সংক্ষেপে এই চারটি বিষয় দ্বারা আমরা এই সমগ্র জগতের একটি ব্যাখ্যা পাই।

বুদ্ধ দর্শনের সর্বাঙ্গবাদ সম্প্রদায়ও খেরবাদ গুচেছর অন্তর্ভুক্ত। সর্বাঙ্গবাদ সব কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে। (সর্বম অস্তিত্ব)। যে বস্তুগুলি বর্তমান আছে, ধ্বংস হয়ে যায় না কিন্তু তাদের অস্তিত্বের পদ্ধতি একটু অদ্ভুত ধরনের। এই মতবাদ অনুসারে সকল বস্তুই ভবিষ্যতে বিরাজ করে।

ভবিষ্যৎ হতে তারা বর্তমানে আসে। বর্তমান হতে তারা অতীতে যায়। অতীতে গমন করে তারা সঞ্চিত হয় এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকে। নির্বাণের একটি পারিভাষিক নাম আছে যথা,- প্রতিসংখ্যা নিরোধ। এখানে নিরোধ বলতে পৃথকীকরণ (বিয়োগ) বুঝায়। প্রতিসংখ্যা হল লোকান্তর প্রজ্ঞা। লোকান্তর প্রজ্ঞা উৎপত্তির সাথে সাথে একজন লোকের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সমস্ত ক্লেশ থাকে সমস্তই ধ্বংস হয়ে যায়। তখন সত্ত্বগণ সমস্ত ক্লেশ হতে মুক্ত হয়। তার মানে তিনি নির্বাণ উপলব্ধি করেন। অতএব প্রতিসংখ্যা নিরোধ এবং নির্বাণ হল একই শব্দ (বিষয়)।

বুদ্ধ দর্শনের সৌত্রান্ত্রিক সম্প্রদায়ের এখন আর কোন গ্রন্থ নেই। এই সম্প্রদায়ের সমস্ত গ্রন্থ কালের অতলে হারিয়ে গেছে। তাদের কেবল সমালোচনা পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থে যখন পণ্ডিতগণ সৌত্রান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মতবাদের উদ্ধৃতি দেন তখন তারা মাত্র কয়েকটি বাক্য ব্যবহার করেন। অতএব এই সম্প্রদায়ের মতবাদ সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। মাঝে মধ্যে উদ্ধৃতি ও উল্লেখ থেকে আমরা এই মাত্র বলতে পারি যে, সৌত্রান্ত্রিক সম্প্রদায়ের ধারণায় নির্বাণ হল 'না বোধক' (negative)।

তারপর আসে বুদ্ধ দর্শনের মাধ্যমিক সম্প্রদায়। এখানে আচার্য নাগার্জুন একটি পদ্ধতি (মতবাদ) দিয়েছেন যা কেবল তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। তা শূন্যবাদ নামেও কথিত হয়। শূন্যের অর্থ 'না বোধক' নয় কিন্তু এই পদ্ধতির মতবাদ অনুসারে চরম সত্য অথবা বাস্তবতার

আসল প্রকৃতি মৌখিক বা লিখিত বিবৃতি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এটি মনুষ্য কল্পনার বাইরে। যেহেতু এই সকল বিবেচনার বাইরে। অতএব একে শূন্য নামে অভিহিত করা হয়।

বুদ্ধ দর্শনের শেষ সম্প্রদায় হল যোগাচার। বিজ্ঞানবাদ নামেও কথিত হয়। এই মতবাদানুসারে মনই হল একমাত্র বাস্তব সত্য (বিষয়)। মন নিজকে নানারূপে প্রকাশ করে। সত্যি কথা বলতে কি জানার মত বস্তুও নেই, বিষয়ও নেই। তাদিগকে পরিষ্কারভাবে না বুঝে কেউ এই দর্শনকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। জাগতিক সর্ব বিষয় মনের বহির্প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ মন আলায় বিজ্ঞান নামে কথিত হয়। যখন মন সকল ক্লেশ (কলুষ) হতে মুক্ত হয় তখন একে বিমল বিজ্ঞান বলা হয়। এটাই নির্বাণের অবস্থা বা মনের রূপান্তর নামে কথিত হয়। অনুপাদিশেষ নির্বাণ হল বিশ্বজনীন চেতনা বা বিজ্ঞান। যেহেতু আকাশ সর্বত্র, সুতরাং বিমল বিজ্ঞানও সর্বত্র উপস্থিত থাকে (বিদ্যমান)। এই বিমল বিজ্ঞান তথতা, সুঞঞতা, তথাগত-গর্ভা; বুদ্ধকায়, ধর্মকায় ইত্যাদি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন নদীসমূহ বিভিন্ন দিকে গমন করলেও সর্বশেষ সাগরে গিয়ে পতিত হয় এবং তাদের আলাদা অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে, তদ্রূপ সত্ত্বগণ যারা এই অবস্থা অর্থাৎ অনুপাদিশেষ নির্বাণ প্রাপ্ত হন তাঁরা বিশ্বজনীন চেতনায় বা বিজ্ঞানে মিশে যান। এটাই বুদ্ধের ধর্মতা বা ধর্মকায়।

আমরা মনে করি, এটা ভুল। কারণ মহাপরিনির্বাণের পরে বুদ্ধ তাঁর উপদেশে অবস্থান করেন অর্থাৎ ত্রিপিটকে। তার মানে বুদ্ধবাক্য বা বুদ্ধবাণীতে তিনি অবস্থান করেন। সেজন্য ত্রিপিটক পূজা করা উচিত। বুদ্ধবাণী না থাকলে বুদ্ধও আর থাকবেন না।

জৈন ঐতিহ্যঃ

জৈন ধর্মে দুটি সম্প্রদায় রয়েছে। তাঁরা দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর নামে পরিচিত তাঁদের বাহ্যিক প্রকাশের (চেহারার) কারণে। দিগম্বর সন্ন্যাসীরা উলঙ্গ থাকেন। তাঁরা একটি ছোট্ট ন্যাকড়াও পরিধান করেন না। তাঁরা তাঁদের হস্তে আহার নিয়ে থাকেন। তাঁরা একই পদ্ধতিতে জলও পান করে থাকেন। শ্বেতাম্বর সন্ন্যাসিগণ সাদা কাপড় ব্যবহার করেন এবং অতএব তাঁরা শ্বেত বস্ত্রধারী নামে কথিত হয়ে থাকেন। তাঁরা বলে থাকেন যে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর একটি আত্মা আছে। হাতির আত্মার আকার হাতির অনুরূপ। অনুরূপভাবে একটি পিপীলিকার ভিতর একটি পিপীলিকার অনুরূপ আত্মা আছে। আত্মা পরিশুদ্ধ এর প্রকৃতিতে কিন্তু তা কার্যবলীর মাধ্যমে দূষিত হয়। এ কথিত হয়ে থাকে যে, যখন একটি কাজ করা হয়, এর পরিণতি বিপাক তৈরী হয় যা জড়। তা ধূলি কণার অনুরূপ। ধূলি কণা যেমন একজন মানুষের দেহ ময়লা করে, অনুরূপভাবে কাজের কণাগুলোও আত্মাকে

কলুষিত করে। এই কারণে তখন কোন বন্ধন থাকবে না যখন আত্মার এই সমস্ত কণা দূরীভূত করা হয়, মানুষ মুক্ত হয়ে যায়।

কর্ম এবং পুনর্জন্ম

দর্শনের প্রায় সকল পদ্ধতিই বলে, পুনর্জন্ম আছে। মানুষ এক অস্তিত্ব থেকে আরেক অস্তিত্বে যায় সূদূর অতীত হতে। আমরা বলতে পারি না কখন হতে এই অস্তিত্বের শুরু এবং কখন শেষ হবে যদিও আমরা সকলে বিশ্বাস করি যে, পুনর্জন্ম আছে। কিন্তু তা সপ্রমাণ করা যায় না। কেউ দেখেনি যে, সে অতীতে কি ছিল অথবা ভবিষ্যতেই বা সে কি হবে।

যদিও আমরা তা প্রমাণ করতে পারি না তবুও আমরা অস্তিত্বের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারি না। আমরা প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে তার প্রমাণ পাই। আমরা দেখি যে, একজন পিতার চারজন ছেলেমেয়ে আছে। সকলেই একই বাড়িতে বাস করে, একই খাদ্য গ্রহণ করে এবং তারা পিতামাতা হতে একই সুযোগ গ্রহণ করে। তবুও তাদের চরিত্রে পার্থক্য আছে। একজন তার প্রকৃতিতে নম্র, দয়ালু এবং বুদ্ধিমান। আরেকজন নিষ্ঠুর এবং জড়বুদ্ধি সম্পন্ন। তাদের মধ্যে একজন সম্পূর্ণ উদাসীন হতে পারে। কেন এই রকম হয়। বাড়ি, খাদ্য ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এরূপ পার্থক্য খুঁজে পাই না। তা হলে এই পার্থক্যের মূলে কি?

উত্তর এই যে, আমরা বাহ্যিকভাবে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি না। আমরাও তাদিগকে সেরকম দেখি না। তা হলে কি? এটি একটি অপরিজ্ঞাত সত্য। কোন সময় বলা হয় ঈশ্বর (ব্রহ্মা); কোন সময় কর্ম। প্রাচ্য দর্শনের কোন কোন শাখায় এও বিশ্বাস করা হয় যে, মানুষ স্বর্গ ও নরকে যায়। নিঃসন্দেহে তা কাজের মাধ্যমে। তবুও কাজ এবং শাস্তির প্রকৃতি ইত্যাদি ঈশ্বর কর্তৃক বিচার হবে। তারা বলে যে, ঈশ্বর পর্যবেক্ষক। তিনি মানুষের কার্যকলাপ খেয়াল করেন এবং তদনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা করেন এবং পুরস্কারেরও। তা হলে কে এক অস্তিত্ব থেকে আরেক অস্তিত্বে যায়। এটি আত্মা, একটি শাস্ত্ব সত্তা। বৈদিক ও জৈন দর্শন একই পদ্ধতি স্বীকার করে।

চার্বাক পদ্ধতির দর্শনও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না। তারা বলে যে এই শেষ জীবন। মৃত্যুর পর মানুষ পুনরায় অস্তিত্বে আসে না। সে চিরকালের জন্য চলে গেছে। অতএব একজন ভাল কাজ করেছে অথবা একজন মন্দ কাজ করেছে উভয়েই একই পরিণতি ভোগ করবে। পাপ এবং পুণ্য কাজের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য নেই।

বুদ্ধদর্শনও পুনর্জন্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। কর্ম আইনের দ্বারা পরিচালিত (শাসিত) হয়। অতএব কর্ম শব্দটি কেবলমাত্র কাজ নয়, বরঞ্চ এটি একটি বিশ্বাস বা পথপ্রদর্শক মূলনীতি।

বুদ্ধধর্ম বিশ্বাস করে যে, ভাল কর্ম মানুষকে দেবলোকে এবং মন্দ কর্ম মানুষকে নরকে নিয়ে যায়। ভাল এবং মন্দ কাজ নির্ধারণ করা হয় কুশল এবং অকুশল হেতুর দ্বারা। এরূপে যতদিন পর্যন্ত কাজের সংস্কার (impression) চলতে থাকে অস্তিত্বে আসার সম্ভাবনা থেকে যায়। যখন পূর্বতন সংস্কার আর না থাকে, মানুষ হয় মুক্ত এবং আর পুনর্জন্ম হয় না। এরূপে কর্ম-আইন অস্তিত্বের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে বৌদ্ধ ঐতিহ্য মতে।

সত্ত্বগণের (দৈহিক ও মানসিক) প্রকৃতিতে কর্মের প্রভাব

বুদ্ধদর্শন কর্ম এবং পুনর্জন্মের মতবাদে বিশ্বাস করে। এই মতবাদানুসারে প্রত্যেক কাজ এর একটি ফল (প্রতিক্রিয়া) প্রদান করে। এই ফল মনের মৌলিক প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়। এগুলো নতুন কর্মের বীজ নামেও অভিহিত হয়।

আমরা এখন দেখব কিভাবে একটি কাজ একজন সত্ত্বের প্রকৃতিতে প্রভাব ফেলে। একজন মানুষ যে কুশল কর্ম সম্পাদন করেছে তার উদাহরণ গ্রহণ করা যাক। ইহা কথিত হয়ে থাকে কুশল কর্মের হেতু হল কুশল হেতু, যথা,- অলোভ, অদ্বेष, অমোহ। যদি একজন মানুষ তার অতীত জন্মে কুশল কর্ম করে এবং তিনটি কুশল মূলের উন্মুক্ত সাধন করে থাকে, সে ঐ রকম কাজের ফলে এমন একজন মনুষ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করবে যার প্রকৃতি ত্যাগ, মৈত্রী ও বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হবে। তার মানে সে একজন ত্যাগী মনোবৃত্তির, মৈত্রী ভাবাপন্ন এবং বুদ্ধিবৃত্তির মানুষ হবে। যদি এই সমস্ত কুশল হেতুর চর্চা না করা হয়ে থাকে তা হলে স্বাভাবিক ভাবেই (গতিতেই) ঐ সমস্ত মনোবৃত্তির অভাব হবে। আমাদের তিন ধরনের মানুষের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হোক। আমরা একটি মানুষ দেখি যে দয়ালু। তার অনেক বন্ধুও আছে কিন্তু সে জড় বুদ্ধিসম্পন্ন। এর জন্য অভিধর্ম ব্যাখ্যা দেয় যে, সে পূর্বজন্মে ভালমতে অমোহের চর্চা করেনি। আমরা আরেক ধরনের মানুষ দেখি যে বুদ্ধিমান এবং মৈত্রীভাবাপন্ন কিন্তু সে একজন কৃপণ। অভিধর্ম মতে তার কৃপণতার ব্যাখ্যা হবে যে, সে তার পূর্বজন্মে অলোভের চর্চা ভালমতে করেনি। আরেক ধরনের মানুষ দেখি যে বুদ্ধিমান এবং দয়ালু। কিন্তু তার কোন বন্ধু নেই। তার ঐরূপ মনোবৃত্তির কারণ হল সে পূর্বজন্মে অদ্বেষের চর্চা করেনি। এরূপ কাজসমূহ একজন সত্ত্বের মনোবৃত্তিসমূহ নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালিত করে।

উপরোক্ত পটভূমিতে আমরা বলতে পারি যে, যখন ৩টি কুশল হেতু পূর্বজন্মে চর্চা (অভ্যাস) করা হয় তখন সে দান, মৈত্রী এবং বুদ্ধিমত্তা-এই ৩টি মনোবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত

হবে। ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে ত্রিহেতুক সত্ত্ব (পুদ্গল) বলা হয়। এও দৃষ্ট হয় যে, ২টি হেতু পূর্ববর্তী জন্মে চর্চা করা হয়, কিন্তু অন্যটি পুরাপুরিরূপে উন্নত করা হয়নি। ঐরূপ ক্ষেত্রে ২টি উন্নত হেতু সত্ত্বটির মন ভবিষ্যৎ জন্মে নিয়ন্ত্রণ করে। ঐরূপ ব্যক্তিগণ দ্বিহেতুক। কিছু কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা পূর্ববর্তী জন্মে হেতুগুলির কোনটিতেই উন্নতি লাভ করেননি। ঐরূপ ক্ষেত্রে ৩টি অনুন্নত হেতু ভবিষ্যৎ জন্মে তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঐরূপ ব্যক্তিগণ অহেতুক নামে অভিহিত হন।

কিভাবে নির্বাণ লাভ করতে হয়

বৌদ্ধ যোগঃ

যোগ শব্দের দ্বারা আমরা বুঝি সমাধি অথবা চিন্তের (মনের) একাগ্রতা সাধন। রক্ষণশীল পদ্ধতির (মতের) যোগানুসারে একে চিন্তবৃত্তি নিরোধ নামে অভিহিত করা হয়। গীতায় ভগবান কৃষ্ণ যোগকে “যোগং কন্মসু কৌশলং” নামে অভিহিত করেছেন। যদিও তাঁর সংজ্ঞাকে ভিন্ন ধরনের মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তারা একই। সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে সকলেই ব্যাখ্যা করেছেন যে, যোগ হল কোন বিষয়ের উপর মনের একাগ্রতা বা কেন্দ্রীভূত অবস্থা। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধদর্শনের মতে জীবনের সর্বোচ্চ চরম লক্ষ্য হল নির্বাণ লাভ করা।

নির্বাণকে জীবনের পরম লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যখন সকল কলুষ উপকরণসমূহ বা সংযোজন মন হতে দূরীভূত হয়ে যায় এবং মন সকল কলুষ হতে মুক্ত হয়, তখন বলা হয় ‘নির্বাণ উপলব্ধ হয়েছে’। ঐরূপ নির্বাণ হল ইচ্ছাসমূহ (তৃষ্ণা) হতে মুক্ত মনের অবস্থা।

কিভাবে এরকম অবস্থা অর্জন করা যায় তার জন্য ভগবান বুদ্ধ সমাধি নামে একটি পথ (মার্গ) প্রদর্শন করেছেন। মন প্রকৃতি অনুসারেই চপল, অস্থির এবং চঞ্চল। যখন মনের ঐরূপ অবস্থা বন্ধ করা হয় এবং যখন তা একাগ্র হয়, তখন একজনের বুঝা উচিত যে, সে সমাধি (ধ্যান) লাভ করেছে।

কিভাবে সমাধি অভ্যাস করতে হয় সেটি একটি প্রশ্ন। যোগাবচর (সমাধি অভ্যাসকারী, ধ্যানী) তার মনকে নানাদিক হতে টেনে নিয়ে (নানাদিকে যেতে না দিয়ে) একটি বিষয়ে চিন্তকে নির্দিষ্ট (নিবিষ্ট) করে। চিন্ত বা ভাবনার বিষয়কে আলম্বন পালিতে আরম্ভণ বলে। এই লক্ষ্যে ৪০টি বিষয়ের একটি লম্বা তালিকা প্রদত্ত হয়েছে যা শমথ ভাবনা নামে অভিহিত। তাকে এই সমস্ত বিষয়ে (যে কোন একটিতে) তার মন নির্দিষ্ট করতে বলা হয়েছে। এগুলো নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হতে পারে।

- (ক) **দশ কৃৎস্ন (কসিন) :** কসিন শব্দটির মানে গোলাকার বস্তু। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, একটি গোলাকার মৃত্তিকা খণ্ড। সর্বপ্রথম যোগাবচরকে একটি বস্তু নিতে হয় যা স্থূল। তাদের এমন বস্তু নিয়েই আরম্ভ করা উচিত যা অতি সুক্ষ্ম না হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে দশ কৃৎস্ন উপস্থিত করা হয়েছে। এগুলো হল পৃথিবী কসিন (পৃথিবী কৃৎস্ন) আপো কসিন (জল কৃৎস্ন), তেজো কসিন (অগ্নি-শিখা কৃৎস্ন) বায়ো কসিন (বায়ু কৃৎস্ন) ইত্যাদি। এগুলি গোলাকার বস্তু হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে।
- (খ) **দশ অশুভ :** এগুলো সংখ্যায় দশ যা অশুভ নামে অভিহিত হয়। কারণ আমক শ্মশানে নিষ্কিণ্ড একটি মৃতদেহ দশ রকমের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, নিষ্কিণ্ড মৃত দেহের পচা শব অবস্থা, বিনীলক অবস্থা (যে মৃতদেহ মাংস বহুল স্থানে রক্তবর্ণ ও পুঁজ সঞ্চিত স্থানে শ্বেতবর্ণ এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে নীলবর্ণ বা নীল বস্ত্রবৃত্ত তুল্য দেখা যায়, তাকে বিনীলক মৃতদেহ বলে), কৃমিপূর্ণ শব এবং ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। শরীর হতে পুঁজ নির্গত হয় এবং শরীর পচে গিয়ে ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ। (মৃত) শরীরের এই অবস্থাগুলো দশ প্রকারের কর্মস্থান (ধ্যানের বিষয়) অশুভ নামে পরিচিত।
- (গ) **দশ অনুস্মৃতি :** অনুস্মৃতি শব্দের অর্থ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা বা অনুশীলন করা। অর্থাৎ কোন বিষয় নিয়ে ধ্যান করা। এরূপে বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্ম্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি ইত্যাদি নিয়ে দশ প্রকারের অনুস্মৃতি। এই সমস্ত (ধ্যানের) বিষয়সমূহ ধারণামূলক ও সুক্ষ্ম
- (ঘ) **চার অপ্রমেয় :** অপ্রমেয় অর্থ সীমাহীন (অপ্রমাণ) ব্রহ্মবিহারের চার অঙ্গ বা বিষয়কে চার অপ্রমেয় ভাবনা (ধ্যান) বলে। এগুলো ঐরূপ কথিত হয়, কারণ ধ্যানের পরিধি সীমাবদ্ধ নহে। আমরা বলতে পারি না যে, মৈত্রী (ধ্যান) কেবল এই এই ব্যক্তিগণের উপর করা হবে। এটা অগণিত সত্ত্বের (বিশ্ব জগতের সকল সত্ত্বের) উপর অভ্যাস করা যায়। আমরা (১) মৈত্রী, (২) করুণা, (৩) মুদিতা, (৪) উপেক্ষা ইত্যাদির পরিধি সীমাবদ্ধ করতে পারি না। ঐরূপ প্রকৃতির জন্য এগুলো অপ্রমেয় (অপ্রমাণ) নামে কথিত হয়। এগুলোও ধারণামূলক এবং সুক্ষ্ম বিষয় মাত্র।

(ঙ) **একাসঞ্জ্ঞা এক সংজ্ঞা :** সংজ্ঞা শব্দটি পারিভাষিক অর্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ। এর মানে আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা। এর দ্বারা এই বুঝায় যে-চর্বা, চুষ্য, লেহ্য, পেয় ইত্যাদি সর্ববিধ আহাৰ্য্য সর্ব অবস্থায়-পরিভোগকালে, অর্দ্ধজীর্ণবস্থায়, জীর্ণবস্থায়, পরিণতাবস্থায় দেহের উপকরণে পরিণত হলেও ঘৃণ্য। এটাই আহারে প্রতিকূল সংজ্ঞা বা এক সংজ্ঞা ভাবনা। এর দ্বারা রস-তৃষ্ণা হতে চিত্ত মুক্ত থাকে এবং রূপ স্কন্ধের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। আমাদের এরূপ চিন্তা করতে করতে আহার করা উচিত- এটা [খাম্য বালকের ন্যায়] ক্রীড়া করবার জন্য নয়, [মল্ল যোদ্ধাদের ন্যায়] শক্তি প্রদর্শনের জন্য নয়, [বারাঙ্গণাদের ন্যায়] অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মণ্ডনের জন্য নয়, [নর্তকীদের ন্যায়] বিভূষণের জন্য নয়, বরঞ্চ রূপকায়ের স্থিতি ও রক্ষার জন্য এবং বুদ্ধ নির্দেশিত একটি পবিত্র জীবন যাপনের জন্য।

(চ) **এক ব্যবস্থান :** ব্যবস্থান শব্দের অর্থ স্থিরকরণ(বিশ্লেষণপূর্বক সিদ্ধান্ত)। দেহস্থ কঠিন, তরল, উষ্ণ ও বায়বীয়- এই চার ধাতু সম্বন্ধে ব্যবস্থান “এক ব্যবস্থান ভাবনা”। এই দেহে আছে (১) কেশাদি কুড়িটি কঠিন জিনিষ, (২) পিত্ত প্রভৃতি বারটি তরল জিনিষ, (৩) নিশ্বাস-প্রশ্বাস, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু ইত্যাদি বায়বীয় পদার্থ এবং (৪) উত্তাপ য দ্বারা সত্তাপ (জ্বর) হয়, যদ্বারা জীর্ণ হয় (কেশ লোমাদি পক্ক হয়), যদ্বারা দাহ (দগ্ধ) হয় এবং যদ্বারা ভুজ্জদ্ব্য পাক হয়, সেই চার প্রকার তেজ ধাতু-এই চতুর্বিধ “ধাতু” (মহাভূত) (পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু) ভিন্ন অন্য কিছু দেহে নেই। এর ফলে “আমি” ধারণা লোপ পায়। রূপস্কন্ধের অনাত্মজ্ঞান ক্রমে নামস্কন্ধের অনাত্মজ্ঞানে পরিচালিত হয়।

(ছ) **চার আরূপ্য বা নিরাকার (অরূপ) ধ্যানঃ** আকাশানঞ্চায়তন (আকাশানন্তায়তন), বিঞ্ঞাণঞ্চায়তন (বিজ্ঞানানন্তায়তন) আকিঞ্চাণ্ণায়তন (অকিঞ্চনায়তন), নেবসঞ্ঞাণাসঞ্ঞায়তন (নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞায়তন) হল চারটি ধ্যান যেগুলো অরূপ। ঐরূপ প্রকৃতির জন্য এগুলো আরূপ্যধ্যান নামে কথিত হয়।

উপরোক্তগুলো হল চল্লিশটি বিভিন্ন ধরনের কর্মস্থান-ধ্যানের জন্য ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক ব্যবস্থাপিত। বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাই আচার্য বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমার্গে।

যোগাবচরের এদের যে কোন একটি বেছে নেওয়া উচিত এবং মন তাতে নিবিষ্ট করতে হবে। পুনরায় আরেকটি প্রশ্ন আসে কিরূপ ব্যক্তি কিরূপ কর্মস্থান গ্রহণ করবেন। এর

উত্তরে বলা হয়েছে যে, তিনি তার কর্মস্থান নির্বাচনের জন্য একজন কল্যাণমিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করবেন। কল্যাণমিত্র (গুরু, আচার্য) হবেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি কোনরূপ বিবেচনা ছাড়াই সকলকে সাহায্য করেন বা যিনি সকল সত্ত্বের শুভাকাজী। সাধারণভাবে তিনি তাদের নিকট কোনরূপ প্রতিদান আশা করবেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বুদ্ধ হলেন সর্বোত্তম কল্যাণমিত্র। বুদ্ধের উপস্থিতিতে একজনকে তাঁর নিকট হতে কর্মস্থান গ্রহণ করা উচিত। তাঁর অনুপস্থিতিতে একজন মহাশ্রাবক হতে কর্মস্থান গ্রহণ করা উচিত। যখন একজন মহাশ্রাবকও উপস্থিত নেই, তখন একজন অনাসব (অর্হৎ), পিটকধর প্রভৃতির নিকট হতে তার সাহায্য নেয়া উচিত।

কর্মস্থান নির্বাচনের ব্যাপারে আরেকটি প্রশ্ন। কল্যাণমিত্র কিভাবে একজন সাধকের নিকট কর্মস্থান নির্দিষ্ট করে দিবেন। তিনি চরিতানুযায়ী তা করবেন। তিনি সর্বপ্রথম ধ্যানাভিলাষী সাধকের বিভিন্ন কার্যাবলী দ্বারা তার মনোবৃত্তি (চরিত্র) বুঝবেন এবং তারপর তার জন্য একটি কর্মস্থান নির্দেশ করে দিবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে পৃথিবীর সকল সত্ত্বকে চরিতগতভাবে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলঃ (১) রাগ (লোভ) চরিত, (২) দ্বেষ চরিত, (৩) মোহ চরিত, (৪) শ্রদ্ধা চরিত, (৫) বুদ্ধি চরিত এবং (৬) বিতর্ক চরিত।

রাগ চরিতের ব্যক্তির হবেন যাদের বিরাট (তীব্র) আসক্তি আছে। দ্বেষ চরিতের ব্যক্তির হবেন যাদের তীব্র বিদ্বেষ আছে। জড় বুদ্ধির লোকেরা হবেন মোহ চরিতের ব্যক্তি। ত্রিরসে যাদের অচল-অটল ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে তাঁরা হবেন শ্রদ্ধা চরিতের লোক। যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা আছে তাঁরা হবেন বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব। চিন্তাশীল (যুক্তি বা বিচার করতে সমর্থ) ব্যক্তিগণ হবেন বিতর্ক চরিতের লোক।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কোন চরিতের লোকের পক্ষে কোন কর্মস্থান প্রযোজ্য। (১) দশ অশুভ ও কায়গতাস্মৃতি ভাবনা রাগ-চরিতের পক্ষে হিতাবহ ভাবনা (ধ্যান); (২) দ্বেষ-চরিতের পক্ষে নীলাদি চার বর্ণ-কৃৎস্ন এবং চার অপ্রেম্যেয়; (৩) মোহ-চরিত ও বিতর্ক-চরিতের পক্ষে আনাপান-স্মৃতি; (৪) শ্রদ্ধা-চরিতের পক্ষে বুদ্ধানুস্মৃতি ইত্যাদি ছয় অনুস্মৃতি; (৫) বুদ্ধি চরিতের পক্ষে মরণ, উপশম, সংজ্ঞা, ব্যবস্থানাদি অনুকূল ভাবনা। অবশিষ্ট কর্মস্থান সকলের পক্ষে উপযোগী।

এতদ্ভিন্ন মন্ডলের নির্বাচনে পৃথুল (স্থূল) মোহ-চরিতের পক্ষে এবং ক্ষুদ্রাকার বিতর্ক-চরিতের পক্ষে উপযোগী।

এখন যোগাবচর একটি নির্জন স্থানে উপবেশন করেন এবং মনকে বিভিন্ন দিক হতে টেনে নিয়ে কর্মস্থানে মনোনিবেশ করেন। এখানে সমাধির (ধ্যানের) প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ত্রিবিধ নিমিত্ত

ধ্যানের প্রক্রিয়ায় তিন প্রকারের নিমিত্ত অর্থাৎ লক্ষণ, চিহ্ন আছে। সেখানে তিনটি স্তর আছে যখন আমরা বিভিন্ন আলম্বনে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখি। স্তরগুলো হল পরিকর্ম নিমিত্ত, উদ্গ্রহ নিমিত্ত ও প্রতিভাগ নিমিত্ত। যখন যোগাবচর এক কর্মস্থান অর্থাৎ ধ্যানের বিষয় বা আলম্বন বেছে নেয় এবং তার মনোযোগ বিভিন্ন দিক হতে টেনে নেয় এবং মন আলম্বনে নিবিষ্ট করে - একে প্রাথমিক ফল (ক্রিয়া) বলে। এই স্তরের বিষয়টিকে পরিকর্ম নিমিত্ত বলে। কিছু অভ্যাসের পর যোগাবচর অনুভব করে যে, একাগ্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু কিছু সময় পরে আলম্বনটি নিজে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং ঐ বাইরের মূর্তি একটি প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়। যখন এ বস্তুটির বাহ্যিক উপস্থিতি সরানো হয় তখন অন্তর্চক্ষুতে ঐ বস্তুটি দেখা যায়। ঐ আলম্বনটিকে উদ্গ্রহ নিমিত্ত বা প্রতিমূর্তি প্রতীক বলা হয়। কিছু সময় পরে ধ্যান যখন আরো উন্নত হয় এবং এই উদ্গ্রহ নিমিত্তে চিত্তকে একাগ্র করতে করতে এমন এক অবস্থা দেখতে পান, যখন নিমিত্তটি একটি জ্বল-জ্বলে এবং শান্ত কর গোলাকার বলে (ball) রূপান্তরিত হয় (ঐ নিমিত্তের অভ্যন্তর হতে এক নির্মল, উজ্জ্বল আকার বহির্গত হচ্ছে)। এই নিমিত্তকে প্রতিভাগ নিমিত্ত বলে। এরূপে আলম্বনের পরিবর্তনানুসারে যোগাবচর এতে তিনটি রূপ দেখতে পায়। এগুলো হল পরিকর্ম, উদ্গ্রহ (মনোগৃহীত) এবং প্রতিভাগ নিমিত্ত।

ত্রিবিধ ভাবনা

এই প্রক্রিয়ায় আমরা মনের বিভিন্ন বিকশিত অবস্থাও চিহ্নিত করতে পারি। সাধক মনকে আলম্বনে একাগ্র করার প্রচেষ্টায় প্রাথমিক অবস্থায় অতি সূচনাতেই যে প্রচেষ্টা (ধ্যান) তাকে পারিভাষিক ভাষায় পরিকর্ম ভাবনা (ধ্যান) বলে। যখন ক্রমশঃ নীবরণসমূহ নিবারণ করা হয় এবং ধ্যানাঙ্গসমূহ দেখা দেয় কিন্তু পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি, সেই রকম অবস্থাকে উপচার সমাধি (ধ্যান) বলে। এটি কামাবচর ধ্যান (কামলোকীয়)। যোগাবচর দেখে, নীবরণ সমূহের আর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যেহেতু ধ্যানাঙ্গসমূহ তখনও শক্তিশালী হয়নি, পরিপূর্ণ একাগ্রতা লাভ করে নি। যখন সকল (পঞ্চ) নীবরণ সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করা হয় এবং ধ্যানাঙ্গসমূহ (বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা) শক্তিশালী হয় (পরিপূর্ণতা লাভ করে) তখন যোগাবচর খাঁটি পুণাঙ্গ একাগ্রতা লাভ করে। একে অর্পণা ভাবনা (ধ্যান) বলে। (ধ্যানাঙ্গসমূহের অনুবলে চিত্ত পঞ্চ নীবরণকে পরীক্ষা করে ও জ্বালিয়ে দেয় বলে এবম্বিধ চিত্তের নাম ঝান বা ধ্যান। এরূপে একাগ্রতা লাভের প্রাথমিক অবস্থা হতে গুরু করে তিনটি স্তর আছে যে তিনটি ভাবনা (ধ্যান) নামে কথিত হয়।

অভিৎঞা (অভিজ্ঞা): এই প্রক্রিয়ায় যোগাবচর পঞ্চ অভিজ্ঞাসহ আসবক্ষয় জ্ঞান অর্জন

করে অর্হত্ব বা নির্বাণ লাভ করেন। অভিঞ্ঞা বা অভিজ্ঞা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'বিশেষ জ্ঞান' (অভি + জ্ঞা = অভিজ্ঞা)। এ ভাবনা সাধককে অতিলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের দিকে পরিচালিত করে। এটি সাধারণের ধারণা বা ক্ষমতার বাইরে। অভিজ্ঞা হয় প্রকার : যথা,- পূর্বনিবাস অভিজ্ঞান (জাতিস্বর জ্ঞান), দিব্যচক্ষু অভিজ্ঞান, পরিচিন্তাচারে অভিজ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধিজ্ঞান (অলৌকিক শক্তি), দিব্যশ্রুতি অভিজ্ঞান, আসবক্ষয় জ্ঞান। আসবক্ষয় জ্ঞান কেবল অর্হত্ব বা নির্বাণ লাভ করলেই অর্জন করা সম্ভব; অন্য পাঁচটি অভিজ্ঞা চতুর্থ ধ্যানে (অভিধর্ম মতে পঞ্চম ধ্যান) দক্ষতা লাভ করলেই লাভ করা সম্ভব।

ধ্যানীদের পক্ষে অভিজ্ঞা বা ঋদ্ধি লাভের চারটি উপায় (পাদ) হল চত্তারো ইদ্ধি পাদা বা চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ (তা চেতনাজাত); (১) ছন্দ ঋদ্ধিপাদ-ঐশী শক্তি লাভের একান্ত অভিলাষ, (২) বীর্য ঋদ্ধিপাদ - ঐশী শক্তি লাভের একান্ত চেষ্টা, (৩) চিত্ত ঋদ্ধিপাদ-ঐশী শক্তি লাভের একান্ত চিন্তা, (৪) বীমংস ঋদ্ধি পাদ - ঐশী শক্তি লাভের একান্ত অনুসন্ধান বা প্রজ্ঞা। এরা প্রত্যেকে অধিপতি স্বভাব বিশিষ্ট। এই চৈতসিক চতুষ্টয় যখন চতুর্থ ধ্যান বলে পরিপুষ্ট লাভ করে, তখনই চিত্ত অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই ঋদ্ধি কামলোকীয় ছন্দ, বীর্য, চিত্ত এবং বীমংস অর্থাৎ প্রজ্ঞায় লাভ হয় না। নানাবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রমের জন্য এদেরকে অধিপতি অবস্থায় গঠন করতে হয়। এই গঠন কার্য চতুর্থ ধ্যানে (অভিধর্মে পঞ্চম ধ্যানে) দক্ষতা লাভেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে। অপিচ উপচার ধ্যান পাদ, প্রথম ধ্যান ঋদ্ধি। স-উপচার প্রথম ধ্যান পাদ দ্বিতীয় ধ্যান ঋদ্ধি। পূর্ব ভাগে পাদ, অপর ভাগে ঋদ্ধি। (বিশুদ্ধি মার্গ ও বিভঙ্গ অর্থকথা দ্রষ্টব্য)।

প্রথম অধ্যায়

পরমার্থ ধর্ম

(তুলনামূলক)

থেরবাদ অনুসারে বায়ান্তর প্রকার পরমার্থ ধর্ম।

যথা,-	চিত্ত	-	১
	চৈতসিক	-	৫২
	রূপ	-	১৮
	নির্বাণ	-	১
	মোট ৭২ প্রকার ধর্ম।		

সর্বাশ্তিবাদ অনুসারে পঁচাত্তর প্রকার পরমার্থ ধর্ম।

যথা,-	চিত্ত	১
	চৈতসিক	৪৬
	রূপ	১১
	চিত্ত বিপ্রযুক্ত ধর্ম	- ১৪
	অসংস্কৃত ধর্ম	৩
	মোট ৪ ৭৫ প্রকার ধর্ম।	

চিত্ত

পরমার্থ ধর্মের তালিকায় উভয় নীতিই চিত্তকে ধর্ম বলে। থেরবাদীরা কামভূমি, রূপভূমি, অরূপভূমি ও লোকান্তর ভূমি অনুসারে চিত্তকে চারভাগে ভাগ করেছেন।

যথা,-

- ১। কামাবচর চিত্ত।
- ২। রূপাবচর চিত্ত।
- ৩। অরূপাবচর চিত্ত।
- ৪। লোকান্তর চিত্ত।

কামাবচর চিত্ত

আরম্ভনং চিন্তেতীতি চিত্তং। বিষয় বা আলম্বন চিন্তা করে অর্থে চিত্ত। এখানে চিন্তা করে অর্থে আলম্বন গ্রহণ করে, আলম্বন জানে, আলম্বন অবগত হয়। চিত্ত, মন, বিজ্ঞান একার্থবোধক। এদের যে কোন একটি অন্য দুটির প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। এদের লক্ষণ যথাক্রমে চিন্তন, মনন ও বিজ্ঞানন। এরাও একার্থবোধক।

বস্তুতঃ চিত্তের কোন একক অস্তিত্ব নেই (Citta is not one entity)। এটি স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয় না, কারণ (প্রত্যয়) ধর্মের বিদ্যমান উৎপন্ন হয়ে থাকে। এটি ক্রমিক নিয়মে চৈতসিক সহযোগে গঠিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সাত প্রকার সর্ব-চিত্ত সাধারণ চৈতসিক চিত্ত গঠন করে থাকে। কিভাবে গঠন করে থাকে? প্রথমে বিষয় বা আলম্বন ইন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত হওয়ার ফলে ইন্দ্রিয়ে স্পর্শ হয়। স্পর্শের কারণে বেদনা উৎপন্ন হয়। বেদনার কারণে সংজ্ঞা (প্রাথমিক জ্ঞান) উৎপন্ন হয়। সংজ্ঞার পর আসে চেতনা। চেতনা চিত্তকে পতন থেকে রক্ষা করে। চেতনার পর একাগ্রতা আসে। একাগ্রতা চিত্তকে বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হতে দেয় না। একাগ্রতার পর উৎপন্ন হয় জীবিতেন্দ্রিয়। জীবিতেন্দ্রিয় হচ্ছে চিত্তের জীবনীশক্তি। জীবিতেন্দ্রিয়ের পর মনস্কার (মনসিকার) আসে। মনস্কার হচ্ছে মনোযোগ। মনস্কার চিত্তকে আলম্বন শূন্য হতে দেয় না। এভাবে সপ্ত-সাধারণ চৈতসিকের দ্বারা চিত্তের অন্তিম স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এই অন্তিম স্বরূপই স্বাভাবিক চিত্ত, প্রভাস্বর চিত্ত। আগন্তুক দোষে চিত্ত দূষিত হয় মাত্র। আগন্তুক দোষ হচ্ছে চার প্রকার আসব। যথা,- কাম, ভব, দৃষ্টি, অবিদ্যা। এগুলো সুপ্তাকারে থেকে সাত প্রকার অনুশয় সৃষ্টি করে। সেগুলো হচ্ছে- কাম-রাগানুশয়, ভব-রাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, মানানুশয়, দৃষ্টানুশয়, বিচিৎসানুশয়, অবিদ্যানুশয়। বলতে গেলে সত্ত্বগুণের চিন্তা, বাক্য ও কার্যগুলো অনুশয়েরই বাহ্য প্রকাশ।

কামাবচর চিত্ত বলতে এক প্রকার চিত্তের পারিভাষিক নাম বুঝতে হবে। এটি স্বভাবতঃ চঞ্চল প্রকৃতির। অন্য কোন বিষয়ে বা আলম্বনে কয়েক মিনিটের জন্যও মন-সংযোগ করতে পারে না বা স্থির থাকতে পারে না। সব সময় কামলোকে বিচরণ করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে আসক্তি উৎপাদন করে। কামবচর চিত্তকে একটি বানরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন, গাছে উপবিষ্ট একটি ফলেচ্ছু বানর সব সময় এক শাখা থেকে অন্য শাখায় ছুটাছুটি, লাফালাফি করে। তেমনি কামাবচর চিত্তও এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে বিচরণ করে আসক্তি উৎপাদন করে।

পঞ্চ নীবরণের প্রভাবে এই চিত্ত স্বাভাবিকভাবে চঞ্চল। তাই কোন বিষয়ে অল্লক্ষণের জন্যও মন-সংযোগ করতে পারে না। এই চিত্ত দ্বারা নির্বাণ লাভ করা কখনো সম্ভব নয়।

কামাবচরে চুয়ান্ন প্রকার চিত্ত। যথা,- অকুশল বার প্রকার, অহেতুক আঠার প্রকার ও সহেতুক কামাবচর চব্বিশ প্রকার। চুয়ান্ন প্রকার চিত্তের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল :

অশোভন চিত্ত

ন + শোভন = অশোভন। শ্রদ্ধাদি সুন্দর গুণযুক্ত নয় বলে এবং সৌভাগ্য উৎপাদন করে না অর্থে অকুশলের অপর নাম অশোভন।

অকুশল কর্ম অকুশল কর্মীকে তার স্বকীয় কর্মের প্রভাবে দুর্গতি প্রাপ্ত করায়। সেজন্য অকুশলের অন্য নাম পাপ। (অকুশলানি হি অন্ত-সমঙ্গিনা সন্তে অন্তনো কম্ম পভাবেন দুগ্গতিং পাপেত্তি, তস্মা পাপানী'তি)।

মহাথের অনুরুদ্ধ রচিত অভিধর্মার্থ সংগ্রহে প্রথমে অকুশল চিত্তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ধর্মসংগনিতে কুশল ধর্মের কথা সর্বপ্রথমেই আলোচিত হয়েছে। কেননা অকুশল আছেই বলেই কুশলের চিন্তা করতে হয়। অবিদ্যা আছে বলেই বিদ্যা উৎপন্ন করতে হয়। অন্ধকারে আছে বলেই আলোর প্রয়োজন হয়। দুঃখ আছে বলেই সুখের অন্বেষণ করতে হয়। জন্ম আছে বলেই জন্ম নিরোধের বা নির্বাণের সাধনা করতে হয়।

অর্থকারেরা বলেন প্রতিসন্ধির পর প্রথম উৎপন্ন চিত্ত লোভ মূলক। এই চিত্তের পরিভাষা 'ভব-নিজ্জান্তি লোভ-জবন'। সেজন্যই অভিধর্মার্থ সংগ্রহে প্রথমেই লোভমূলক, দ্বেষমূলক, মোহমূলক দ্বাদশ প্রকার অকুশল চিত্তের বর্ণনা দিয়ে কামাবচর কুশল, রূপাবচর কুশল, অরূপাবচর কুশল ও লোকোত্তর কুশল চিত্তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

অকুশলের তিনটি মূল। যথা,- লোভ, দ্বেষ, মোহ। এগুলোর সাথে উৎপন্ন কায়কর্ম, বচীকর্ম ও মনোকর্মকে অকুশল কর্ম বলে।

এখানে কায় অকুশল কর্ম হচ্ছে প্রাণাতিপাত, অদত্তগ্রহণ, মিথ্যাকামাচার। এগুলো বহুল পরিমাণে কায়দ্বারে সম্পাদিত হয় বলে কায়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। বাক্ অকুশল কর্ম হচ্ছে মিথ্যা বাক্য, পিণ্ডন বাক্য, পরুষ বাক্য, সম্প্রলাপ বাক্য। এগুলো বাক্ দ্বারে বহুল পরিমাণে সম্পাদিত হয় বলে বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। মনো অকুশল কর্ম হচ্ছে অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি। এগুলো কায় ও বাক্ দ্বারে বিজ্ঞপ্তির আকারে প্রকাশিত হলেও মনেই (জবনচিত্তে) বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

এগুলোর মধ্যে প্রাণাতিপাত, পরুষবাক্য ও ব্যাপাদ দ্বেষমূলক। মিথ্যাকামাচার, অভিধ্যা ও মিথ্যাদৃষ্টি লোভমূলক। অদত্তগ্রহণ, মিথ্যা বাক্য ও সম্প্রলাপ বাক্য লোভ, দ্বেষ উভয়মূলক।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, লোভ, দ্বেষ উভয়ের হেতুও মোহ। মূয়হতী-তি মোহ। মূয়হস্তি সত্তা এতেনাতি মোহ। যা দ্বারা সত্ত্বগণ মুহ্যমান হয়ে থাকে তাই মোহ। সূত্র পিটকে মোহকে অবিদ্যা বলা হয়েছে। অবিদ্যা মানে অজ্ঞানতা। মোহ বা অবিদ্যা সকল প্রকার অকুশল ও দুঃখের মূল।

পূর্বে উক্ত হয়েছে লোভ, দ্বেষ উভয়ের মূল হচ্ছে এই মোহ। কিন্তু লোভ মূলক চিন্তে লোভের প্রাবল্য এবং দ্বেষমূলক চিন্তে দ্বেষের প্রাবল্য থাকাতে মোহের ক্রিয়া এতে অনুভূত হয় না। মোহ কিন্তু একক। অর্থাৎ মোহ লোভ, দ্বেষ বিরহিত। ইষ্টানিষ্ট বোধের অভাব হেতু মোহচিন্তে সৌমনস্য বা দৌর্মনস্যের স্থান নেই। মোহের আধিক্য হেতু মোহচিন্তে বিচিকিৎসা বা ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত। এই চিন্তা আলম্বন বা বিষয়ে অভিনিবেশে অসমর্থ। প্রতীত্য সুমুৎপাদ ধর্ম তথা চার আর্ষ সত্যের জ্ঞানোদয়ে মোহ বিদূরিত হয়। মোহ বা অবিদ্যা বিদূরিত হলে লোভ ও দ্বেষ বিদূরিত হয়। এখানে উল্লেখ্য, অকুশলের পরিণাম দুঃখ। একমাত্র মার্গ বা পথ আর্ষ অষ্টাঙ্গিক মার্গ (অষ্টপথ নয়) এর অনুশীলনে বিদ্যা উৎপত্তিতে মোহ বা অবিদ্যা ধ্বংস করতে পারলেই সর্ব দুঃখের অবসান হয়। উক্ত হয়েছে অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ নিরোধ, নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ, ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ, স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ, বেদনা-নিরোধে, তৃষ্ণা-নিরোধ, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, জন্ম-নিরোধে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের নিরোধ হয়। এক্রূপে সমগ্র দুঃখস্বন্ধের নিরোধ হয়।

[এখানে সংস্কার বলতে কুশল, অকুশল ও আনেঞ্জ সংস্কার বুঝায়]

উপরোক্ত দশবিধ অকুশল কর্মপথ বা কর্মমূল লোভমূলক, দ্বেষমূলক ও মোহমূলক। চিন্তের উৎপত্তি অনুসারে শ্রেণীভাগ করলে এই দশবিধ অকুশল কর্ম দ্বাদশ প্রকার হয়। অর্থাৎ অকুশল চিন্তা দ্বাদশ প্রকার। যথা,- লোভমূলক চিন্তা অষ্টবিধ, দ্বেষমূলক চিন্তা দ্বিবিধ, মোহমূলক চিন্তা দ্বিবিধ।

অশোভন চিত্ত

দ্বাদশ অকুশল চিত্ত

(ক) লোভমূলক চিত্ত অষ্টবিধঃ-

- ১। সৌমনস্য-সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ২। সৌমনস্য-সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত সংস্কারিক চিত্ত।
- ৩। সৌমনস্য-সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ৪। সৌমনস্য-সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সংস্কারিক চিত্ত।
- ৫। উপেক্ষা-সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ৬। উপেক্ষা-সহগত দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত সংস্কারিক চিত্ত।
- ৭। উপেক্ষা-সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ৮। উপেক্ষা-সহগত দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সংস্কারিক চিত্ত।

(খ) দ্বেষমূলক চিত্ত দ্বিবিধ :-

- ৯। দৌর্মনস্য-সহগত প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ১০। দৌর্মনস্য-সহগত প্রতিঘ সম্প্রযুক্ত সংস্কারিক চিত্ত।

(গ) মোহমূলক চিত্ত দ্বিবিধঃ-

- ১১। উপেক্ষা-সহগত বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত চিত্ত।
- ১২। উপেক্ষা-সহগত ঔদ্ধত্য সম্প্রযুক্ত চিত্ত।

অহেতুক চিত্ত

লোভ, দ্বেষ, মোহ হল তিনটি অকুশল বা অনৈতিক হেতু। লোভ মানে লিন্সা, আসক্তি। দ্বেষ হল বিদ্বেষ এবং মোহ হল অজ্ঞানতা, অবিদ্যা। অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ হল কুশল হেতু, নৈতিকতার মূল। অলোভ হল দান, অদ্বেষ হল মৈত্রী এবং অমোহ হল জ্ঞান বা বিদ্যা। হেতুসমূহ হল একটি বস্তু বা বিষয়ের প্রতি আমাদের মনের মৌলিক প্রবণতা। অতএব এগুলো মূল নামে কথিত হয়। গাছের মূলসমূহ যেমন একটি গাছকে ধারণ, প্রতিপালন এবং দৃঢ়পদ করে, তদ্রূপ হেতুসমূহও চেতনা বা চিত্তকে জাগ্রত ও প্রতিপালন করতে সাহায্য করে। এরূপে যেই চেতনা বা চিত্ত এই হেতুসমূহের যে কোন একটির সাথে

যুক্ত হয় তাকে সহেতুক চিত্ত বলে এবং যেই চিত্ত এই সমস্ত হেতুর কোন একটির সাথে যুক্ত থাকে না তাকে অহেতুক চিত্ত বলে।

এর উপর ভিত্তি করেই আমরা সহেতুক ও অহেতুক চিত্তের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে থাকি।

এটা মনে হতে পারে যে, একটি চিত্তের যে কোন একটি হেতু থাকতে হবে। আমাদের মনের মৌলিক প্রবণতামূহ ছাড়া কিভাবে একটি চেতনা বা চিত্ত জাগ্রত হতে পারে।

যদিও প্রশ্নটি কঠিন বলে বোধ হয় তথাপি এর উত্তর আমাদের প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত হয়। আমরা দেখি কতকগুলি কার্য আমাদের অনুরাগ বা ইচ্ছা ব্যতিরেকে সংঘটিত হয়। যেমন, কোন কোন সময় কোথাও যাবার সময় আমরা কোন একটি জিনিষের সম্মুখীন হই এবং এর দিকে তাকিয়ে থাকি। আমরা চাই না এটা ঘটুক। পথিমধ্যে আমরা কোন কোন সময় একটি বিষাক্ত সাপ দেখে থাকি। আমরা কোন সময় ইচ্ছা করি না সাপটি আসুক এবং পথের উপর বসে থাকুক। আমরা যখন ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, যদিও আমরা তা পছন্দ করি না, তবুও তথায় দর্শন কার্য সম্পাদিত হয়ে থাকে। ঐ রকমের চেতনা বা চিত্তই অহেতুক চিত্ত।

দর্শন-কার্য ভাল এবং মন্দ উভয় বিষয়ের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। এমনও হতে পারে আমরা একজন পুণ্যবান ব্যক্তিকে (মুনি, ঋষি, ভিক্ষু) দেখলাম যদিও আমরা যেই পথ দিয়ে যাব সেই মুহূর্তে উপস্থিত থাকার জন্য নিমন্ত্রণ করিনি। এই দর্শন কার্যও অহেতুক চিত্ত এবং আমরা একে চক্ষু-বিজ্ঞান বা চক্ষু-চেতনা নামকরণ করব। যখন ঐরূপ চেতনা বা চিত্ত ভাল বস্তু নিয়ে উৎপন্ন হয় একে কুশল বিপাক অহেতুক চক্ষু-বিজ্ঞান বলা হয়। যখন এটি মন্দ বস্তু নিয়ে উৎপন্ন হয় তখন একে অকুশল বিপাক চক্ষু-বিজ্ঞান বলা হয়।

এরূপে অহেতুক চিত্ত নৈতিক (ভাল) ও অনৈতিক (মন্দ) দুই হতে পারে। তা হলে একটি প্রশ্ন জাগে। চেতনা হল একটি বিষয়ের চিন্তা। কিভাবে চিন্তা হতে পারে যেখানে মনের কোন প্রয়োগ নেই। আমরা কোন বিষয়ের চিন্তা করি না যখন আমরা মনকে সেই বিষয়ে প্রয়োগ করি না। 'চিন্তা' এই বিশেষ শব্দটিই মনের প্রয়োগের ইঙ্গিতবাহী, এবং এই প্রাথমিক প্রয়োগ হেতুর কাজ। কিন্তু এখানে হেতুর কোন কাজ নেই। তাহলে হেতুর কোন কার্য না থাকলে কিভাবে অহেতুক চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং কাজ করে। উত্তর নিম্নলিখিতভাবে বলা যেতে পারে।

বুদ্ধ দর্শন চিত্ত-সত্ত্বতি মতবাদে বিশ্বাস করে। এই মতবাদানুসারে মানুষ আজ যা তা নয়, বরঞ্চ সে পূর্বতন কর্মসমূহের (সংস্কার) সমষ্টি। অতএব অহেতুক চিত্তের বেলায় বিষয়টির

প্রতি মনের অনুরাগ নাও থাকতে পারে। তবুও আমরা এখানে বলতে পারি যে, অহেতুক চিত্ত পূর্বতন কর্মসমূহের (সংস্কার) শক্তির উপর ভিত্তি করে কাজ করে যদিও সেগুলি সক্রিয় চেতনা তথাপি তাদিগকে বিপাক চিত্ত বলা হয়।

অষ্টাদশ অহেতুক চিত্ত

(ক) [পূর্বজন্মকৃত] অকুশলের সপ্তবিধ অহেতুক বিপাক চিত্তঃ

- ১। উপেক্ষা-সহগত চক্ষু-বিজ্ঞান।
- ২। উপেক্ষা-সহগত শ্রোত্র-বিজ্ঞান।
- ৩। উপেক্ষা-সহগত ঘ্রাণ-বিজ্ঞান।
- ৪। উপেক্ষা-সহগত জিহ্বা-বিজ্ঞান।
- ৫। দুঃখ-সহগত কায়-বিজ্ঞান।
- ৬। উপেক্ষা-সহগত সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত।
- ৭। উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ-চিত্ত।

(খ) [পূর্বজন্মকৃত] কুশলের অষ্টবিধ অহেতুক বিপাক চিত্তঃ

- ৮। উপেক্ষা-সহগত চক্ষু-বিজ্ঞান।
- ৯। উপেক্ষা-সহগত শ্রোত্র-বিজ্ঞান।
- ১০। উপেক্ষা-সহগত ঘ্রাণ-বিজ্ঞান।
- ১১। উপেক্ষা-সহগত জিহ্বা-বিজ্ঞান।
- ১২। সুখ-সহগত কায়-বিজ্ঞান।
- ১৩। উপেক্ষা-সহগত সম্প্রতীচ্ছ-চিত্ত।
- ১৪। সৌমনস্য-সহগত সন্তীরণ-চিত্ত।
- ১৫। উপেক্ষা-সহগত সন্তীরণ-চিত্ত।

(গ) ত্রিবিধ অহেতুক ক্রিয়া চিত্তঃ

- ১৬। উপেক্ষা-সহগত পঞ্চদ্বারাবর্তন চিত্ত।
- ১৭। উপেক্ষা-সহগত মনোদ্বারাবর্তন-চিত্ত।
- ১৮। সৌমনস্য-সহগত হসিতোৎপাদ-চিত্ত।

শোভন চিত্ত

শ্রদ্ধাদি সুন্দর গুণযুক্ত বিধায় এবং সৌভাগ্য উৎপাদন করে অর্থে কুশলের অন্য নাম শোভন। ‘কু’র পক্ষে যা শল্য সদৃশ্য তাই কুশল। অথবা পাপ ধ্বংসে যা ‘কুশ’ যুক্ত তাই কুশল। কুশল দুই প্রকার। যথা,- লৌকিক ও লোকান্তর। দান, শীল, ভাবনা লৌকিক কুশল। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা লোকান্তর কুশল।

কুশলের তিনটি মূল। যথা,- অলোভ, অদ্বेष, অমোহ। এই তিনটি মূল বা চৈতসিকের কারণে উৎপন্ন কায়কর্ম, বাক্কর্ম, মনোকর্মকে কুশল কর্ম বলে। কায় কুশল কর্ম হচ্ছে প্রাণীহত্যা থেকে বিরতি, চুরি থেকে বিরতি, ব্যভিচার থেকে বিরতি। বাক্ কুশল কর্ম হচ্ছে মিথ্যা কথন থেকে বিরতি, পিণ্ডন বাক্য থেকে বিরতি, পরুষ বাক্য থেকে বিরতি, সম্প্রলাপ থেকে বিরতি। আর মনোকুশল কর্ম হচ্ছে অভিধ্যা, ব্যাপাদ, মিথ্যাদৃষ্টি থেকে বিরতি। অপর পর্যায়ে কর্মের আকারে কুশলকর্ম দশ প্রকার।

যথা-, (১) দান, (২) শীল, (৩) ভাবনা, (৪) অপচায়ন (গুণশ্রেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান, পূজা), (৫) বৈয়াবৃত্য (সেবা, পরিচর্যা, নিজের কাজের ন্যায় দেশের ও দশের কাজ করা), (৬) পুণ্যদান, (৭) পুণ্যানুমোদন (আনন্দ চিত্তে অন্যের সম্পাদিত পুণ্য কর্মের প্রশংসা), (৮) ধর্মশ্রবণ, (৯) ধর্মোপদেশ, (১০) দৃষ্টি ঋজুকর্ম (সম্যক দৃষ্টি অর্জন)। রূপাবচর কুশল, অরূপাবচর কুশল ও লোকান্তর কুশল কর্মও কুশল কর্ম। এগুলো মনোদ্বারে সম্পাদিত হয়। ভাবনাময় ও অর্পণাজবন সংযুক্ত। ধ্যানাস্থানুসারে রূপাবচর কুশল পঞ্চবিধ। অরূপাবচর কুশল আলম্বন ভেদে চতুর্বিধ। লোকান্তর কুশল মার্গভেদে চতুর্বিধ। চিত্তের উৎপত্তি অনুসারে কামাবচর কুশল আট প্রকার। রূপাবচর কুশল পাঁচ প্রকার। অরূপাবচর কুশল চার প্রকার। লোকান্তর কুশল চার প্রকার। মোট একুশ প্রকার কুশল চিত্ত। এগুলোকেও কুশল কর্ম বলে।

শোভন চিত্ত

চতুর্বিংশতি সহেতুক কামাবচর চিত্ত

(ক) অষ্টবিধ কামাবচর কুশল চিত্তঃ

- ২। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
- ৩। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ৪। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
- ৫। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ৬। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
- ৭। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ৮। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।

বিপাক চিত্ত

বিপাক বলতে চিত্তের দ্বারা কৃত কর্মের ফল হিসাবে প্রাপ্তির আকারে মনের মধ্যে ছাপকে (Impression) বুঝায়। এর সঠিক অর্থে অথবা যথার্থ অর্থে একে বাহ্যিক প্রকাশে দৃষ্ট হয়। ধরুন, এক ব্যক্তি ভিক্ষান্ন দান করল। এটি এক প্রকারের চিত্ত বা দান চিত্ত। পারিভাষিক ভাষায় একে সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত চিত্ত বলা হয়ে থাকে। এটি যখন উৎপন্ন হয় এবং বিলীন হয়ে যায়, এর একটি সংস্কার (ছাপ) আমাদের মনের মধ্যে রেখে যায়। ঐ সংস্কার হল ঐ চিত্তের বিপাক। ধরুন, ঐ কুশল কর্মের ফলে সে একটি ভাল পরিবারে জন্ম গ্রহণ করল, অতিশয় শিক্ষিত, ধনী এবং সংস্কৃতিমণ্ডিত। এটি হল প্রচলিত মতানুসারে ঐ কর্মের বিপাক। কিন্তু আসলে এটি ঐ লোকটির সঞ্চিত বিপাকের বর্হিপ্রকাশ।

(খ) অষ্টবিধ সহেতুক কামাবচর বিপাক চিত্ত :

- ৯। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ১০। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
- ১১। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ১২। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
- ১৩। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ১৪। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
- ১৫। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ১৬। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।

ক্রিয়া চিত্ত

এটি একটি অফলপ্রদ চিত্ত। আমরা জানি প্রত্যেক চিত্তের কাজ (ক্রিয়া) আছে। কর্মের ফলে সেখানে সংস্কারও আছে, যাকে বিপাক বা বিপাক চিত্ত বলা হয়। বিপাক চিত্ত আবার কৃত্য বা কাজ সৃষ্টি করে; এবং এভাবে কাজ করতে থাকে। কখনও থামে না। পক্ষান্তরে ক্রিয়া চিত্তের ক্রিয়া আছে। কিন্তু ক্রিয়ার কোন বিপাক বা প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ কুশলাকুশলের হেতু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং যেহেতু প্রতিক্রিয়া নেই, সেহেতু কৃত কর্ম অঙ্কুরিত হয় না। একে উপেক্ষা চিত্ত বলা হয়। ক্রিয়াচিত্ত শুধু অর্হতের চিত্ত। অনাগামীর নিকটও এই চিত্ত উৎপন্ন হয় না। অর্হৎগণ ক্রিয়া চিত্তের সাহায্যে ধর্মোপদেশ, রূপাবচর ধ্যান, অরূপাবচর ধ্যান, খাদ্য গ্রহণ- ইত্যাদি যাবতীয় কাজ করে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ, যখন তাঁরা খাদ্য গ্রহণ করে থাকেন তখন তাঁরা খাদ্যে কোনরূপ আসক্তি বোধ করেন না। তাঁদের তাতে কোন লোভ নেই। তাঁরা পরিনির্বাণ লাভ (দেহ ত্যাগ) পর্যন্ত দেহকে কার্যক্ষম রাখার জন্যই কেবল খাদ্য গ্রহণ করে থাকেন। অতএব আমরা বলতে পারি ক্রিয়া চিত্ত হল অর্হৎগণের চিত্ত যা দ্বারা তাঁরা চলে থাকেন। তাঁদের কোন কিছুতেই আসক্তি নেই। কারণ তাঁরা ইতিমধ্যেই আসক্তিসমূহ ক্ষয় করেছেন। ‘তে খীণবীজা অবিরুল্হিদ্দা’।

(গ) অষ্টবিধ সহেতুক কামাবচর ক্রিয়া চিত্তঃ

- ১৭। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ১৮। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
- ১৯। সৌমনস্য-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ২০। সৌমনস্য সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
- ২১। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ২২। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-সম্প্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।
- ২৩। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।
- ২৪। উপেক্ষা-সহগত জ্ঞান-বিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।

রূপাবচর চিত্তঃ

রূপে অবচরতীতি রূপাবচরং। যে চিত্ত রূপে বিচরণ করে একে রূপাবচর চিত্ত বলে। রূপাবচর চিত্ত ধ্যান চিত্তের একটি পারিভাষিক নাম। একাগ্রতার দ্বারা এটি অতীব শক্তিশালী ও তীক্ষ্ণ সম্পন্ন চিত্ত। এত বেশী উন্নত যে কোন ধ্যেয়-আলম্বনে অতি সহজে সমাধিস্থ হয়ে থাকে। সমাধি হল চিত্তের পূর্ণ একাগ্রতা। পূর্ণ একাগ্রতাই চিত্তের অর্পণা। এটিই পূর্ণ ধ্যানের অবস্থা। অর্পণা ব্যতীত রূপাবচর চিত্তের ধারণা করা যায় না।

অর্পণা প্রাপ্তির জন্য প্রথমে সাধক গৃহী হলে পঞ্চশীল অথবা উপোসথ শীলে অধিষ্ঠিত হন। প্রব্রজিত হলে প্রব্রজ্যশীলে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করেন। অতপর স্থায়ী চরিত্রানুযায়ী কর্মস্থান গ্রহণ করেন অথবা কল্যাণমিত্র নির্বাচিত (চরিত্রানুযায়ী) কর্মস্থান গ্রহণ করেন। তিনি সাময়িকভাবে নির্জন বিহারী হন। বাসগৃহ, জ্ঞাতি পরিজন, সাংসারিক লাভ-ক্ষতি, জনতা, কার্যভার, দেশভ্রমণ, শারীরিক ব্যাধি ও গ্রন্থাদি জনিত বাধা এবং সকল প্রকার উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করেন।

এরপর তিনি গৃহীত কর্মস্থান বা ধ্যেয় আলম্বনে পরিকর্ম ভাবনা করেন। অর্থাৎ তিনি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনকে সংযত করে যড়ালম্বনে অমনোযোগী হয়ে গৃহীত কর্মস্থানে একাগ্রতার সাথে দিবারাত্র ধ্যান করার পদ্ধতিতে অনবরত অবিচ্ছিন্ন-ভাবনা করেন। এভাবে তিনি যে বিষয়ে ধ্যান করেন, সেটার পারিভাষিক নাম পরিকর্ম নিমিত্ত। নিমিত্ত অর্থ বিষয়। পরিকর্ম নিমিত্তে পরিকর্ম ভাবনার ফলে সেই সেই কর্মস্থান চর্মচক্ষু-দৃষ্ট বিষয় বা আলম্বনের ন্যায় মনশ্চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয়ে থাকে। মনশ্চক্ষে দৃষ্ট হওয়ার পারিভাষিক নাম উদ্গ্রহ নিমিত্ত। উদ্গ্রহ অর্থ মনোগৃহীত। উদ্গ্রহ নিমিত্তে সেই সেই মনশ্চক্ষে দৃষ্ট বিষয় নির্মল বা উজ্জ্বল আকার ধারণ না করলেও অর্থাৎ মনশ্চক্ষে সেই সেই ধ্যেয় বিষয়ের যথাযথ আকার দৃষ্ট না হলেও পরিকর্ম ভাবনার প্রভাবে মনশ্চক্ষে সেই সেই ধ্যেয়বিষয়ের যথাযথ আকার দৃষ্ট হয়ে থাকে। যথাযথ আকার দৃষ্ট হওয়ার পারিভাষিক নাম প্রতিভাগ নিমিত্ত। এভাবে পরিকর্ম ভাবনার প্রভাবে ধীরে ধীরে পঞ্চনীবরণ যথা,- কামচ্ছদ, ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা দমিত হতে থাকে। পঞ্চনীবরণ যখন সম্পূর্ণরূপে দমন হয়ে যায় তখন সাধক উপচার সমাধিতে নিমজ্জিত হন। উপচার সমাধি হল কামাবচর ধ্যানের অন্তিম অবস্থা এবং রূপাবচর ধ্যান-চিন্তের সমীপচারী চিন্ত। এই অবস্থায় পঞ্চ নীবরণের স্ত্যানমিদ্ধের অপগমনে বিতর্ক, বিচিকিৎসার অপগমনে বিচার, ব্যাপাদের অপগমনে প্রীতি, ঔদ্ধত্য, কৌকৃত্যের অপগমনে সুখ এবং কামচ্ছদের অপগমনে একাগ্রতা উৎপন্ন হয়ে থাকে।

বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা-রূপাবচর ধ্যানের এই পঞ্চ অংগ। এখানে উল্লেখ্য, বিতর্ক চিন্তকে অন্য আলম্বন থেকে নিয়ে আসে। বিচার চিন্তকে ধ্যেয় বিষয়ে নিমজ্জিত করে রাখে। রূপাবচর ধ্যান চিন্ত এক প্রকার। কিন্তু ধ্যানঙ্গের উৎপত্তিতে সাধক পাঁচ প্রকার রূপাবচর ধ্যান লাভ করে থাকে। পাঁচ প্রকার রূপাবচর ধ্যানই পাঁচ প্রকার রূপাবচর কুশল চিন্ত, পাঁচ প্রকার বিপাক চিন্ত এবং পাঁচ প্রকার ক্রিয়া চিন্ত। এভাবে মোট পনের প্রকার রূপাবচর চিন্তের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হল :

(ক) **পঞ্চবিধ রূপাবচর কুশল চিত্ত :**

- ১। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান কুশল চিত্ত।
- ২। বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত দ্বিতীয় ধ্যান কুশল চিত্ত।
- ৩। প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত তৃতীয় ধ্যান কুশল চিত্ত।
- ৪। সুখ, একাগ্রতা সহিত চতুর্থ ধ্যান কুশল চিত্ত।
- ৫। উপেক্ষা, একাগ্রতা সহিত পঞ্চম ধ্যান কুশল চিত্ত।

(খ) **পঞ্চবিধ রূপাবচর বিপাক চিত্তঃ**

- ১। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান বিপাক চিত্ত।
- ২। বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত দ্বিতীয় ধ্যান বিপাক চিত্ত।
- ৩। প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত তৃতীয় ধ্যান বিপাক চিত্ত।
- ৪। সুখ, একাগ্রতা সহিত চতুর্থ ধ্যান বিপাক চিত্ত।
- ৫। উপেক্ষা, একাগ্রতা সহিত পঞ্চম ধ্যান বিপাক চিত্ত।

(গ) **পঞ্চবিধ রূপাবচর ক্রিয়া চিত্তঃ**

- ১। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত প্রথম ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।
- ২। বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত দ্বিতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।
- ৩। প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সহিত তৃতীয় ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।
- ৪। সুখ, একাগ্রতা সহিত চতুর্থ ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।
- ৫। উপেক্ষা, একাগ্রতা সহিত পঞ্চম ধ্যান ক্রিয়া চিত্ত।

অরূপাবচর চিত্ত :

অরূপে অবচরতীতি অরূপাবচর। যে চিত্ত অরূপে বিচরণ করে একে অরূপাবচর চিত্ত বলা হয়। অরূপাবচর চিত্ত ধ্যান চিত্তের একটি পারিভাষিক নাম।

এই চিত্ত পঞ্চম ধ্যানিক। এর মুখ্য ধ্যানাংগ হচ্ছে-উপেক্ষা ও একাগ্রতা। এটি আলম্বন ভেদে চার প্রকার হয়ে থাকে, অংগ ভেদে নয়। অরূপাবচর চিত্ত এক প্রকার চিত্তের নাম যা অরূপ আলম্বনে একাগ্রতা লাভে সমর্থ। এটি ধ্যানের দ্বারা প্রাপ্ত চিত্তের পরিশুদ্ধ অবস্থা মাত্র। এরূপ চিত্তের চার অবস্থা। যথা,- ১। আকাশ অনন্ত আয়তন, ২। বিজ্ঞান অনন্ত

আয়তন, ৩। অকিঞ্চ আয়তন ৪। না সংজ্ঞা না অসংজ্ঞা আয়তন। এই অবস্থায় চিত্ত অতি সুক্ষ্ম হয়ে থাকে।

নির্বাণকামী সাধক রূপাবচর ধ্যানে সঙ্কট না হয়ে উত্তরোত্তর ধ্যানের প্রভাবে অরূপাবচর ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় চিত্ত অরূপ আলম্বন (আয়তন) গ্রহণ করে। সাধকের প্রাপ্তি অনুসারে এগুলো (অরূপ আলম্বন) চার প্রকার। যথাঃ আকাশানন্তায়তন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, অকিঞ্চায়তন, নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন।

অরূপাবচর ধ্যানে পৃথক কোন ধ্যেয় আলম্বন গ্রহণ করতে হয় না। ধ্যেয় আলম্বনে (যে আলম্বনে অরূপাবচর ধ্যানে উপনীত করে) অরূপাবচরের প্রথম স্তরে সাধক 'অনন্ত আকাশ'কে ধ্যানের আলম্বন গ্রহণ করে। সে সময় সাধকের চক্ষে প্রতিভাত হয় আকাশ অসীম, আকাশ অনন্ত, আকাশ সর্বত্র, প্রত্যেক কিছুতে আকাশ বিদ্যমান। মেঘান্তরালে আকাশ, গ্রহনক্ষত্রাবলীর মধ্যে আকাশ, প্রতি দৃশ্যমান বস্তুর ফাঁকে ফাঁকে আকাশ, এমন কি দেহের প্রতি লোমকূপেও আকাশ। আরও প্রতিভাত হয় যে, মেঘ অন্তর্হিত হয়ে গেছে, নক্ষত্রাবলী নিভে গেছে। সসম্ভার পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে গেছে, নিজেও আকাশে লীন হয়ে গেছে, শুধু অনন্ত আকাশ চিত্ত অধিকার করে আছে। চিত্তের এরূপ অবস্থাকে আকাশ অনন্ত আয়তন বলা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় স্তরে, ধ্যানের প্রভাবে ধ্যেয়-আলম্বনে নিজের চিত্তকে আরো একত্র করে সাধক বুঝতে পারে চিত্তের বা বিজ্ঞানের অস্তিত্বই বাস্তব। অনন্ত আকাশের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই। এটি চিত্তেরই প্রতিফলনমাত্র। তাই চিত্ত বা বিজ্ঞানই অনন্ত, অসীম ইত্যাদি সাধকের মনে প্রতিভাত হয় এবং সাধক বিজ্ঞানকেই অনন্ত আয়তন (আলম্বন) হিসেবে গ্রহণ করে ধ্যান করতে থাকে। চিত্তের এরূপ অবস্থাকে বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন বলা হয়ে থাকে।

তৃতীয় স্তরে, সাধক ধ্যানের প্রভাবে ধ্যেয়-আলম্বনে নিজের চিত্তকে আরও একত্র করে বুঝতে পারে চিত্তের কোন স্বকীয় অস্তিত্ব নেই, এটি একান্তই অবিদ্যমান। অবিদ্যামানে বিদ্যমান প্রজ্ঞাপ্তি মাত্র। বস্তুতঃ চিত্ত কতকগুলো চৈতন্যিক সহযোগে গঠিত হয়ে থাকে [পূর্বেও উক্ত হয়েছে]। কদলী বৃক্ষে যেমন কোন সারবস্তু পাওয়া যায় না, তেমনি চিত্তেও কোন সারবস্তু দৃষ্ট হয় না। তাই এই অনন্ত চিত্তও 'কিছু না' এভাবে সাধকের চিত্তে প্রতিভাত হতে থাকে। সাধক চিত্ত 'কিছুই না' আলম্বন গ্রহণ করে ধ্যান করতে থাকে। চিত্তের এরূপ অবস্থাকে অকিঞ্চন আয়তন বলা হয়ে থাকে।

চতুর্থ স্তরে, ধ্যানের প্রভাবে সাধকের চিত্ত এতই সুক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, এই অবস্থায় চিত্ত পার্থক্য ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং কোন বিষয় গ্রহণ করতে পারে না। তাই এই চিত্তকে 'নৈব সংজ্ঞা' বলে। এই সময় চিত্তের সম্পূর্ণ নিরোধ হয় না বলে একে 'না সংজ্ঞা' বলে।

এজন্যই অরূপাবচরের চতুর্থ চিত্তের 'নৈব-সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন কুশল চিত্ত' নামকরণ হয়েছে।

আলম্বন অনুসারে অরূপাবচর চিত্ত কুশল, বিপাক ও ক্রিয়াভেদে দ্বাদশ প্রকার।

(ক) চতুর্বিধ অরূপাবচর কুশল চিত্তঃ

- ১। আকাশানন্তায়তন কুশল চিত্ত।
- ২। বিজ্ঞানানন্তায়তন কুশল চিত্ত।
- ৩। অকিঞ্চিনায়তন কুশল চিত্ত।
- ৪। নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন কুশল চিত্ত।

(খ) চতুর্বিধ অরূপাবচর বিপাক চিত্তঃ

- ৫। আকাশানন্তায়তন বিপাক চিত্ত।
- ৬। বিজ্ঞানানন্তায়তন বিপাক চিত্ত।
- ৭। অকিঞ্চিনায়তন বিপাক চিত্ত।
- ৮। নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন বিপাক চিত্ত।

(গ) চতুর্বিধ অরূপাবচর ক্রিয়া চিত্তঃ

- ৯। আকাশানন্তায়তন ক্রিয়া চিত্ত।
- ১০। বিজ্ঞানানন্তায়তন ক্রিয়া চিত্ত।
- ১১। অকিঞ্চিনায়তন ক্রিয়া চিত্ত।
- ১২। নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন ক্রিয়া চিত্ত।

লোকোত্তর চিত্তঃ

অভিধর্ম অনুসারে কামাবচর চিত্ত, রূপাবচর চিত্ত ও অরূপাবচর চিত্ত লৌকিক বা পার্থিব চিত্ত নামে কথিত। লৌকিক চিত্ত ব্যতীত অন্যগুলোকে লোকোত্তর বা অপার্থিব চিত্ত বলে। লোকোত্তর অবস্থায় নির্বাণ সাক্ষাতকরণের সমস্ত বাধা সমূলে বিনষ্ট হয়ে থাকে এবং নির্বাণ প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। এই অর্থে একে লোকোত্তর বলা হয়ে থাকে। আট প্রকার লোকোত্তর চিত্ত। তন্মধ্যে চার প্রকার কুশল এবং চার প্রকার বিপাক।

যোগাবচর যদিও বা রূপ বা অরূপ সমাধির দ্বারা চিত্তের একাগ্রতার পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন, তবুও লোকান্তর ভূমিতে পৌঁছতে তাঁর নিজের মধ্যে বীজাকারে দশ প্রকার সংযোজন দেখতে পান। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সংযোজন সমূহ সমূলে বিনষ্ট না হয়, যোগাবচর নির্বাণ প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। তা জেনে যোগাবচর সেগুলো বিনষ্টে মনোযোগী হন। প্রথমতঃ তিনি শমথ/বিদর্শন ভাবনার দ্বারা সংকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ এই তিনটি সংযোজন বিনষ্ট করেন। এই তিনটি সংযোজনের বিনষ্টে তিনি স্রোতাপন্ন হন। অর্থাৎ তিনি নির্বাণ পথের পথিক হন। এই সকল সংযোজন বিনষ্টের দুটি স্তর আছে। প্রথম চিত্তক্ষেপে যোগাবচর সেই সংযোজনসমূহ বিনষ্ট করেন এবং দ্বিতীয় চিত্তক্ষেপে তিনি জানেন সংযোজনসমূহ বিনষ্ট হয়েছে। অনুরূপভাবে, এই দুই চিত্ত ক্ষেপের দুই স্তরের দুটি পারিভাষিক নাম আছে। সংযোজন সমূহের বিনষ্টে যোগাবচরের এই সম্যক প্রধানকে মার্গ চিত্ত বলে এবং সংযোজনগুলো বিনষ্ট হয়েছে বলে যে জ্ঞান, তাকে ফলচিত্ত বলে। এভাবে স্রোতাপত্তি মার্গচিত্ত এবং স্রোতাপত্তি ফলচিত্ত নামে দুই চিত্ত। যাঁরা স্রোতাপত্তি মার্গচিত্ত এবং স্রোতাপত্তি ফলচিত্ত লাভে স্রোতাপন্ন হন, তাঁরা সপ্ত জন্নেই পরিনির্বাণিত হয়ে থাকেন।

কাম-রাগ ও প্রতিষ এই দুটি খুব শক্তিশালী সংযোজন। এগুলো প্রথম চেষ্টায় মূলে বিনষ্ট করা যায় না। তাই যোগাবচর প্রথমে এগুলো দুর্বল করে এদের মূল হালকা করে ফেলেন। এভাবে তিনি সকৃদাগামী হয়ে থাকেন। এর অর্থ হল একবার মাত্র ভবে আগমণকারী। এই অবস্থায় পৌঁছে যোগাবচর যদি পরিনির্বাণ লাভ করতে না পারেন, তা হলে তাঁকে সংসারে আরেকবার আসতে হবে এবং এই জন্নেই তিনি পরিনির্বাণ লাভ করবেন। পূর্বের ন্যায় এখানেও দুটি স্তর আছে। সংযোজনের দুর্বলীকরণে যোগাবচরের সম্যক প্রধানকে সকৃদাগামী মার্গচিত্ত এবং উক্ত সংযোজনগুলো (কাম-রাগ ও প্রতিষ) দুর্বলীকরণের জ্ঞানকে সকৃদাগামী ফল চিত্ত বলে। এভাবে সকৃদাগামী চিত্ত মার্গ ও ফল ভেদে দুই প্রকার।

যোগাবচর এখন দুর্বল সংযোজনসমূহ সমূলে বিনষ্ট করার জন্য তৎপর হন এবং দৃঢ়ভাবে ভাবনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি দেখতে পান সংযোজনসমূহ দুর্বল এবং অতিসহজে তিনি সেগুলো বিনষ্ট করতে সমর্থ। সেরূপ চিন্তা করে তিনি সেগুলো সমূলে বিনষ্ট করেন। সেগুলো বিনষ্টের ফলে তিনি অনাগামী হন। অনাগামী অর্থে, তিনি সংসারে আর কখনো আগমন করবেন না। তিনি যদি এই জীবনে পরিনির্বাণ লাভ না করেন, মৃত্যুর পরে তিনি পঞ্চাঙ্গদ্বাবাস নামক রূপলোকের কোন এক রূপলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন।

চিত্তের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সহজে দেখতে পাই যোগাবচর প্রথম চিত্তক্ষেপে সংযোজন সমূলে বিনষ্ট করেন এবং পরবর্তী চিত্তক্ষেপে তিনি তা জ্ঞানতঃ জানেন সংযোজনসমূহ সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। এই দুই প্রকার সম্যক প্রধানকে যথাক্রমে অনাগামী মার্গচিত্ত এবং

অনাগামী ফলচিহ্ন বলে। দশটি সংযোজনের মধ্যে তিনটি সংযোজন যথা,- সংকায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও শীলব্রত-পরামর্শ প্রথম স্রোতাপত্তি ফলে, কাম-রাগ ও প্রতিঘ এই দুটি সংযোজন সকৃদাগামী ফলে দুর্বল হয়ে অনাগামী ফলে সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়। এই পাঁচটি সংযোজনকে নিম্নভাগীয় সংযোজন বলে। রূপ-রাগ, অরূপ-রাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা এই পাঁচটিকে উর্দ্ধভাগীয় সংযোজন বলে। অনাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হবার পর যোগাবচর উর্দ্ধভাগীয় সংযোজনসমূহ সমূলে বিনষ্টের জন্যে আরও দৃঢ়ভাবে ভাবনায় মনোনিবেশ করেন। এতে তিনি উর্দ্ধভাগীয় সংযোজনসমূহ সমূলে বিনষ্ট করে অর্হৎ হন। এর অর্থ এই যে, তিনি এখন জন্ম-মৃত্যু চক্রের অধীন নন। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর করণীয় সম্পাদিত, দুঃখের বোঝা নিষ্কিণ্ড, তৃষ্ণা বিশুদ্ধ; নির্বাণের পথ পর্যটন পরিসমাপ্ত। এটাই হচ্ছে পরিনির্বাণের অবস্থা। এটাকে বলে সউপধি পরিনির্বাণ। মৃত্যুর পরে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন। তিনি আর কখনো ইহ সংসারে বা অন্য কোন লোকে জন্মগ্রহণ করবেন না। এটাকে বলে নিরূপধি পরিনির্বাণ।

চিন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রকার সম্যক প্রধানকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটা হচ্ছে, যখন তিনি সংযোজনসমূহ সমূলে বিনষ্ট করেন, দ্বিতীয়টা হচ্ছে, তিনি যখন তা জানেন। এগুলোর পারিভাষিক নাম যথাক্রমে অরহন্ত মার্গ চিত্ত এবং অরহন্ত ফলচিহ্ন। এভাবে লোকান্তর ভূমিতে চার প্রকার মার্গ চিত্ত এবং চার প্রকার ফল চিত্ত। মোট আট প্রকার চিত্ত। মার্গচিত্তকে কুশলচিত্ত এবং ফলচিত্তকে বিপাক চিত্ত বলে।

এই প্রসঙ্গে ইহা বলা যুক্তিযুক্ত, কিভাবে আট প্রকার লোকান্তর চিত্ত চল্লিশ প্রকার হয়ে থাকে। উক্ত হয়েছে, একজন যোগাবচর স্রোতাপত্তি মার্গ, স্রোতাপত্তি ফল; সকৃদাগামী মার্গ, সকৃদাগামী ফল; অনাগামী মার্গ, অনাগামী ফল; অরহন্ত মার্গ, অরহন্ত ফল-এর প্রত্যেক স্তরে রূপধ্যানের পাঁচ প্রকার ধ্যান অভ্যাস করতে পারেন। এভাবে আট প্রকার চিত্ত পাঁচ প্রকার ধ্যান = চল্লিশ প্রকার হয়ে থাকে। এভাবে উননব্বই প্রকার চিত্ত একশত একুশ প্রকার হয়ে থাকে (৮৯-৮ = ৮১ + ৪০ = ১২১)।

চতুর্বিধ লোকান্তর কুশল চিত্ত :

- ১। স্রোতাপত্তি-মার্গ-চিত্ত।
- ২। সকৃদাগামী-মার্গ-চিত্ত।
- ৩। অনাগামী-মার্গ-চিত্ত।
- ৪। অরহন্ত-মার্গ-চিত্ত।

চতুর্বিধ লোকোত্তর বিপাক চিত্তঃ

- ৫। শ্রোতাপত্তি-ফল-চিত্ত।
 ৬। সকৃদাগামী-ফল-চিত্ত।
 ৭। অনাগামী-ফল-চিত্ত।
 ৮। অরহত্ব-ফল-চিত্ত।

এই অষ্টবিধ লোকোত্তর কুশল ও বিপাক চিত্ত।

চিত্ত গণনাঃ

অকুশল বার চিত্ত, কুশল একুশ,
 ছত্রিশ বিপাক চিত্ত, ত্রিয়া চিত্ত বিশ।
 কামেতে চুয়ান্ন চিত্ত, রূপেতে পনর,
 দ্বাদশ অরূপ চিত্ত, অষ্ট অনুত্তর।
 একুননবুতি চিত্ত এইরূপে হয়।
 একশ একুশ কিংবা বিচক্ষণ কয়।

অথবা

অকুশল চিত্ত - ১২ (৮+২+২)
 কুশল চিত্ত - ২১ (৮+৫+৮+৮)
 বিপাক চিত্ত - ৩৬ (৭+৮+৮+৫+৮+৮)
 ত্রিয়া চিত্ত - ২০ (৩+৮+৫+৮)
 সর্বমোট - ৮৯

অথবা

কামাবচর চিত্ত - ৫৪ (১২+১৮+২৪)
 রূপাবচর চিত্ত - ১৫ (৫+৫+৫)
 অরূপবচর - ১২ (৮+৮+৮)
 লোকোত্তর চিত্ত - ৮ (৮+৮)
 সর্বমোট - ৮৯

অথবা পূর্বোক্ত

৮৯-৮=৮১৮১+৮০

সর্বমোট ১২১

দ্বিতীয় অধ্যায়

চৈতন্য

খেরবাদ অনুসারে চৈতন্যের সংখ্যা বায়ান্ন প্রকার। চৈতন্য সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। তবুও বলতে হয় চৈতন্যগুলো চিত্ত উৎপত্তি এবং রক্ষায় সাহায্য করলেও এই প্রসঙ্গে আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে চৈতন্যগুলো পৃথক করা বা পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে দেখান যায় না। কেননা, এগুলো চিত্ত সত্ত্বিতে বিদ্যমান। চিত্ত চৈতন্য পরস্পর সহজাত প্রত্যয়। তাই, আমরা একে অন্য থেকে ভিন্ন দেখাতে একটি পরিষ্কার সীমারেখা টানতে পারি না। অন্য অর্থে বলতে হয়, চিত্তের সাথে একসাথে উৎপন্ন হয়, একসাথে নিরুদ্ধ হয়, এক আলম্বন ও এক বাস্তব গ্রহণ করে এমন চিত্তযুক্ত বায়ান্ন প্রকার চিত্তবৃত্তির নাম চৈতন্য।

গাথাঃ

একত্র “উৎপত্তি”, “রোধ” চিত্তের সহিত,
এক “আলম্বন”, “বাস্তব” একত্র গৃহীত।
চিত্তসনে যুক্ত হেন বায়ান্নটা বৃত্তি,
তারা সবে পাইয়াছে চৈতন্য খ্যাতি।

চৈতন্যের শ্রেণীভাগঃ

- (ক) সাত প্রকার সর্ব-চিত্ত সাধারণ চৈতন্য। যথা,- স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয়, মনস্কার।
- (খ) ছয় প্রকার প্রকীর্ণ চৈতন্য। যথা,- বিতর্ক, বিচার, অধিমোক্ষ, বীর্য, প্রীতি, হৃদয়।
এই তের প্রকার চৈতন্যের সাধারণ নাম “অন্য সমান” চৈতন্য।
- (গ) চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতন্য। যথা,- মোহ, অহী, অনপত্রপা, ঔদ্ধত্য, লোভ, দৃষ্টি, মান, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎস্যর্য, কৌকৃত্য, স্ত্যান, মিদ্ধ, বিচিকিৎসা।
- (ঘ) উনিশ প্রকার শোভন সাধারণ-চৈতন্য। যথা,- শ্রদ্ধা, স্মৃতি, হ্রী, অপত্রপা, অলোভ, অদ্বেষ, তত্রমধ্যস্থতা, কায়-প্রশক্তি, চিত্ত-প্রশক্তি কায়-লঘুতা, চিত্ত-লঘুতা, কায়-মৃদুতা, চিত্ত-মৃদুতা, কায়-কর্মণ্যতা, চিত্ত-কর্মণ্যতা, কায়-প্রগুণতা, চিত্ত-প্রগুণতা, কায়-ঋজুতা, চিত্ত-ঋজুতা।

- (ঙ) তিন প্রকার বিরতি চৈতসিক যথা,- সম্যক্-বাক্য, সম্যক্ কৰ্ম, সম্যক্ আজীব ।
 (চ) দুই প্রকার অপ্রমেয় চৈতসিক । যথা,- করুণা, মুদিতা ।
 (ছ) এক প্রকার প্রজ্ঞেন্দ্রিয় চৈতসিক । যথা,- প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ।

উপরোক্ত (ঘ) থেকে (ছ) পর্যন্ত পঁচিশ প্রকার চৈতসিককে “শোভন-চৈতসিক” বলে ।

স্মারক গাথা

অন্য-সমান তের, চৌদ্দ অকুশল,
 শোভন পঁচিশ সহ বায়ান্ন সকল ।

চৈতসিকের সম্প্রয়োগ

সাত চৈতসিক যুক্ত সর্ব চিত্ত সনে;
 ছয়টি প্রকীর্ণ যুক্ত যথাযোগ্য স্থানে;
 চৌদ্দ চৈতসিক-যোগ অকুশল চিতে;
 শোভন সংযুক্ত হয় শোভনের সাথে ।

সাত প্রকার সর্বচিত্ত-সাধারণ চৈতসিক ৮৯ প্রকার চিত্তের সাথে উৎপন্ন হয় । এবং স্বাভাবিক চিত্ত গঠন করে । ‘প্রকীর্ণ’ শব্দটির অর্থ বিস্তীর্ণ, অসম্বন্ধ । প্রকীর্ণ চৈতসিক সমূহ শোভন-চিত্তে বা অশোভন-চিত্তে আবদ্ধ থাকে না । উভয়বিধ চিত্তে এদের সংযোগাধিকার আছে । এজন্য এগুলোর নাম প্রকীর্ণ চৈতসিক । এগুলো যখন শোভন চিত্তে যুক্ত হয় তখন কুশলকর্মে এবং যখন অশোভন-চিত্তে যুক্ত হয় তখন অকুশল কর্মে সাহায্য করে ।

চৌদ্দ প্রকার অকুশল চৈতসিকের মধ্যে মোহ, অহী, অনপত্রপা, ঔদ্ধত্য এই চার চৈতসিক “সব-অকুশল-চিত্ত-সাধারণ” । এগুলো দ্বাদশ অকুশল চিত্তে উৎপন্ন হয় । বাকী অকুশল চৈতসিকসমূহ অকুশল চিত্তের যথাযোগ্য স্থানে যুক্ত হয় ।

পঁচিশ প্রকার শোভন চৈতসিকের মধ্যে উনিশ প্রকার শোভন-সাধারণ চৈতসিক ঊনষাট প্রকার শোভন-চিত্তের (২৪+১৫+১২+৮) প্রত্যেকটিতে বিদ্যমান থাকে । বাকী চৈতসিক সমূহ কুশল চিত্তের যথাযোগ্য স্থানে সংযুক্ত হয় ।

বিস্তারিত সম্প্রয়োগ শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি অনুমোদিত ও সম্পাদিত অভিধর্মার্থ সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্তসার অভিধর্ম দেখুন ।

সর্বাঙ্গিবাদ মতে চৈতন্য বা চৈত (চিত্ত ধর্ম) ছয়চল্লিশ প্রকার। সেগুলো ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা,- চিত্ত মহাভূমিক ধর্ম, (২) কুশল মহাভূমিক ধর্ম, (৩) ক্লেশ মহাভূমিক ধর্ম, (৪) অকুশল মহাভূমিক ধর্ম, (৫) উপক্লেশ মহাভূমিক ধর্ম এবং (৬) অনিয়ত ভূমিক।

(ক) চিত্ত মহাভূমিক ধর্ম সংখ্যায় দশ প্রকার। যথা,- (১) বেদনা, (২) সংজ্ঞা, (৩) চেতনা, (৪) স্পর্শ, (৫) ছন্দ, (৬) মতি, (৭) স্মৃতি, (৮) মনসিকার, (৯) অধিমোক্ষ, (১০) সমাধি। চিত্ত মহাভূমিক ধর্মসমূহ সর্ব চিত্তের সাথে সর্ব-সাধারণ। এগুলো ব্যতীত কোন চিত্ত উৎপন্ন হতে পারে না। সেজন্য এগুলোকে সর্বচিত্ত-সাধারণ-চৈতন্য বলে।

(খ) কুশল মহাভূমিক ধর্ম সংখ্যায় দশ প্রকার। যথা,- (১) শ্রদ্ধা, (২) বীর্য, (৩) উপেক্ষা, (৪) হিরী, (৫) অপত্রপা, (৬) অলোভা, (৭) অদ্বৈষ, (৮) অহিংসা, (৯) প্রশক্তি, (১০) অপ্রমাদ। কুশল মহাভূমিক ধর্মসমূহ সকল কুশল চিত্তের সাথে সর্ব-সাধারণ। সেজন্য এগুলোকে সর্ব-কুশল- চিত্ত চৈতন্য বলে।

(গ) ক্লেশ মহাভূমিক ধর্ম সংখ্যায় ছয় প্রকার। যথা,- (১) মোহ, (২) প্রমাদ, (৩) কৌসিদ্য, (৪) অশ্রদ্ধা, (৫) স্থীন, (৬) উদ্ধত। ক্লেশ মহাভূমিক ধর্মসমূহ সকল অকুশল চিত্তের সাথে সর্বসাধারণ। সেজন্য এগুলোকে সর্ব-অকুশল-চিত্ত চৈতন্য বলে।

(ঘ) অকুশল মহাভূমিক ধর্ম সংখ্যায় দুই প্রকার। যথা,- (১) অহিরী, (২) অনপত্রপা। অকুশল মহাভূমিক ধর্মসমূহ সকল অকুশল চিত্তে বর্তমান থাকে।

(ঙ) উপক্লেশ ভূমিক ধর্ম সংখ্যায় দশ প্রকার। যথা,- (১) ক্রোধ, (২) মরক্ষ বা কপটতা, (৩) মাৎসর্য, (৪) ঈর্ষা, (৫) প্রদান বা প্রতিযোগিতা বিষয়ক শক্তি, (৬) বিহিংসা, (৭) উপন্যাস বা পরশীকাতরতা, (৮) মায়া, (৯) শাঠ্য বা শঠতা, (১০) মদ। উপক্লেশ ভূমিক ধর্ম কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞান ধাতুর সাথে যুক্ত হয়। অন্য অর্থে এগুলো প্রথম পঞ্চ বিজ্ঞান ধাতুর সাথে যুক্ত হয় না। কারণ এগুলো তাদের আপন সীমায় সীমাবদ্ধ থাকে। এই অর্থে এগুলোকে পরিত্ত ভূমিক বলে।

(চ) অনিয়ত ভূমিক ধর্ম সংখ্যায় আট প্রকার। যথা,- (১) কৌকৃত্য বা অনুশোচনা, (২) মিত্র বা তন্দ্রা, (৩) বিতর্ক বা মনকে আলম্বনে নিযুক্ত রাখা, (৪) বিচার বা মনকে আলম্বনে ধরে রাখা, (৫) রাগ বা আসক্তি, (৬) দ্বৈষ, (৭) মান, (৮) বিচিকিৎসা বা সন্দেহ। অনিয়ত ভূমিক ধর্মকে প্রকীর্ত্ত চৈতন্য বলে। কেননা এগুলো সব সময় সকল চিত্তধর্মের সাথে যুক্ত হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

রূপ ধর্ম

হেঁরবাদ অনুসারে পরমার্থ ধর্ম হিসেবে রূপধর্ম আঠার প্রকার ।

চিত্ত ব্যতীত সকল বস্তুই রূপ নামে পরিচিত । যা আমরা আমাদের চতুর্দিকে দেখি, যেমন চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ; এবং চুল, জিহ্বা, দাঁত, নখ, রক্ত, হাড়, যা আমাদের শরীরে দেখে থাকি । এগুলো হচ্ছে রূপের বিভিন্ন আকৃতি । তাই আমরা বলতে পারি, যা বাহ্যিক বস্তু এবং অভ্যন্তরীণ সত্ত্বা গঠন করে তাকে রূপ বলে ।

বুদ্ধদর্শনে রূপ গুণের আকারে গৃহীত হয়েছে । কোন কোন ধর্মমতে রূপ স্থূল আকারে গৃহীত হয়েছে । আবার কোন কোন ধর্মমতে রূপ আত্মিক আকারে গৃহীত হয়েছে । বুদ্ধদর্শন, যা মধ্যমপথ নামে পরিচিত, রূপ স্থূল আকারে বা আত্মিক আকারে গৃহীত হয়নি । এই দর্শনে রূপ গুণের আকারে ধরা হয়েছে । তাই রূপকে রূপধর্ম বলা হয়েছে ।

আমরা আমাদের চারদিকে পৃথিবী (মাটি) দেখে থাকি । অতি সহজে বলতে পারি আমরা পৃথিবী দেখছি । আমরা পৃথিবীকে জানি কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে যেই পৃথিবী আমরা দেখি তা প্রকৃত পৃথিবী নয় । আমরা স্থূলাকারে পৃথিবী (মাটি) দেখতে পাই না । বাহ্যিক বস্তুসমূহ যা আমরা ক্ষেত্রাকারে, গৃহাকারে, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি আকারে দেখে থাকি, তা হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন রং ও আকার । তাই পৃথিবীর প্রকৃত সংজ্ঞা বলা খুবই কঠিন ব্যাপার ।

বুদ্ধদর্শন বলে এটি প্রকৃত পৃথিবী নয় । কক্খলতা বা কঠিন তা-ই প্রকৃত পৃথিবী । অগ্নি যা আমরা আমাদের রান্নাঘরে দেখি তা প্রকৃত অগ্নি নয় । প্রকৃত অগ্নি হচ্ছে উত্তাপ । অনুরূপভাবে গতি হচ্ছে বায়ু । সংসক্তি হচ্ছে জল । সংসক্তির প্রভাবে বস্তুসমূহ পিণ্ডিভূত হয়ে থাকে । এগুলো থেকে প্রমাণিত হয় বুদ্ধদর্শনে রূপের ধারণা হচ্ছে গুণ । রূপধর্ম প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত । যথা,- ভূতরূপ এবং উপাদারূপ । ভূতরূপ বলতে মৌলিক রূপধর্মকে বুঝায় । উপাদারূপ বলতে ভূতোৎপন্ন রূপধর্মকে বুঝায় ।

ভূতরূপ চার প্রকার এবং উপাদারূপ চব্বিশ প্রকার । এভাবে মোট আঠাশ প্রকার রূপধর্ম বুদ্ধদর্শনে গৃহীত হয়েছে । ভূতরূপ এবং উপাদারূপ এই দ্বিবিধ রূপ একাদশ ভাগে বিভক্ত যথাঃ

- ১। ভূতরূপঃ পৃথিবীধাতু, আপধাতু, তেজধাতু, বায়ুধাতু।
উপাদারূপ-
- ২। প্রসাদরূপঃ চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায়;
- ৩। গোচররূপ : রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস;

এই প্রসঙ্গে আমাদের বুঝতে হবে ফোট্টক (স্প্রষ্টব্য) কায়ের বিষয়। যেহেতু পৃথিবীধাতু, তেজধাতু এবং বায়ুধাতু স্পর্শের দ্বারা বুঝা যায়, সেহেতু এগুলো কায়ের বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়েছে। যেহেতু এগুলো পূর্বে ভূতরূপ হিসেবে গণনা করা হয়েছে, সেহেতু ফোট্টক রূপ (গোচররূপ) এখানে বাদ পড়েছে।

- ৪। ভাবরূপ : স্ত্রীভাব, পুংভাব;
- ৫। হৃদয়রূপ : হৃদয় বাস্তু;
- ৬। জীবিতরূপ : জীবিতেন্দ্রিয়;
- ৭। আহাররূপ : কবলীকৃত আহার।

উপরোক্ত সাত ভাগে বিভক্ত আঠার প্রকার রূপধর্মই থেরবাদে পরমার্থ ধর্ম হিসেবে সংগৃহীত হয়েছে। উপরিবর্ণিত আঠার প্রকার রূপধর্ম ব্যতীত আরও দশ প্রকার রূপধর্মের উল্লেখ আছে। এগুলোকে অনিষ্পন্ন রূপধর্ম বলে। নিষ্পন্ন বলতে যা উৎপন্ন হয়। আঠার প্রকার রূপধর্মকে নিষ্পন্নরূপ বলে। কেননা এগুলো কর্ম, চিন্তা, ঋতু, আহার এই চার উপাদানের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে। বাকী দশ প্রকার রূপধর্মকে অনিষ্পন্ন রূপ বলে। সত্য কথা বলতে কি, এই দশ প্রকার রূপধর্ম সরাসরি চারটি মূল উপাদানের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। বরঞ্চ এগুলো অন্যান্য রূপধর্মের সংযোগে উৎপন্ন হয়ে থাকে। দশ প্রকার অনিষ্পন্ন রূপধর্মের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

- ৮। পরিচ্ছেদ রূপ : আকাশধাতু। আকাশ বলতে শূন্যস্থানকে বুঝায়। প্রত্যেক জিনিস যেমন গৃহ, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি রূপধর্ম শূন্যস্থানে অবস্থান করে। যেখানে কোন শূন্যস্থান নেই, সেখানে কোন জিনিষের অবস্থিতির ধারণা করা যায় না। তাই আকাশকে পরিচ্ছেদ বলে।
- ৯। বিজ্ঞপ্তি রূপ : কায় বিজ্ঞপ্তি, বাক্‌বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞপ্তিরূপ দুই প্রকার। যথা,- কায় বিজ্ঞপ্তি এবং বাক্‌ বিজ্ঞপ্তি। আমাদের শরীরে চারটি অবস্থান-পরিবর্তন আছে যথা,- শোয়া, বসা, দাঁড়ান, গমন। এগুলোকে কায়কর্ম বলে। প্রতিটি কর্ম অপর কর্ম থেকে পৃথক। একটি কর্ম থেকে অন্য কর্মটিকে পৃথক করে জ্ঞাপন করে অর্থে কায় বিজ্ঞপ্তি।

বাক্যের দ্বারা আমরা অনেক কথা বলি। প্রতিটি কথা অপর কথা থেকে পৃথক। একটি কথা থেকে অন্য কথাটিকে পৃথক করে জ্ঞাপন করে অর্থে বাক্‌বিজ্ঞপ্তি।

- ১০। বিকাররূপ : লঘুতা, মৃদুতা, কর্মণ্যতা। কখনো কখনো আমরা কোন জিনিসকে হালকা বলি, আবার কখনো কখনো ভারী বলি। আবার কখনো কখনো মৃদু বা শক্ত বলি। তা যা হোক না কেন, অভিধর্ম এর ব্যাখ্যা দিয়েছে যখন সেই নির্দিষ্ট রূপধর্মে লঘুত্ব বা ভারীত্ব বা মৃদুতা আগমন করে তখন হালকা বা ভারী বা মৃদু বা শক্ত হয়ে থাকে। কর্মণ্যতা অর্থে আলম্বন গ্রহণ করার উপযুক্ততা। এভাবে বিকাররূপ বুঝতে হবে।
- ১১। লক্ষণরূপ : উপচয়, সন্ততি, জরতা, অনিত্যতা। উপচয়-উৎপন্ন হওয়া। সন্ততি-প্রবাহ বা যতদিন একজন লোক বা কোন বস্তু বেঁচে বা টিকে থাকে। জরতা-জীর্ণতা। অনিত্যতা-ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া।

লক্ষণরূপ বলতে রূপধর্মের লক্ষণ বুঝতে হবে। মনে করি, আমি একটি টেবিল তৈরী করলাম। যখন টেবিলটি তৈরী করলাম, তখন বুঝতে হবে টেবিলটি উপচয় হল। টেবিল তৈরীর পরে সেই টেবিল অনেকদিন স্থায়ী থাকে। স্থায়ী থাকার অপর নামই সন্ততি। স্থায়ী থাকার কালে সেই টেবিলটি ক্ষণে ক্ষণে জীর্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে বুঝতে হবে। একদিন এমন সময় আসবে যখন দেখা যাবে টেবিলটি একবারে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছে। এই জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থাকে রূপধর্মের জীর্ণতা বা জরতা বলে। আবার এমনই সময় আসবে সেই টেবিলটি একেবারে নষ্ট-বিনষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ ব্যবহারের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলেছে। একে বলে রূপধর্মের অনিত্যতা। এভাবে সমস্ত রূপধর্মের লক্ষণরূপ বুঝতে হবে।

উপরোক্ত আঠার প্রকার নিষ্পন্নরূপ এবং দশ প্রকার অনিষ্পন্নরূপ, মোট আটাশ প্রকার রূপধর্ম।

স্মারক গাথা

ভূত, প্রসাদ, গোচর, ভাব ও হৃদয়,
জীবিত, আহার সহ অষ্টাদশ হয়।
পরিচ্ছেদ ও বিজ্ঞপ্তি, বিকার, লক্ষণ,
অনিষ্পন্ন দশ; মোট আটাশ গণন।

সর্বাঙ্গিবাদ এর মতে রূপধর্মের সংখ্যা একাদশ প্রকার। এর মতেও সমস্ত রূপধর্মকে ভূতরূপ এবং উপাদা রূপ হিসেবে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভূতরূপ সমূহকে মহাভূত বলে। ভূতকে উপাদান বলে। কেননা, এগুলো উপাদারূপের জন্মদাতা। কিন্তু এদের উপাদান এবং গুণ এক নয়। এরা উভয়ে স্বাবলম্বী।

ভূতরূপ সংখ্যায় চার প্রকার। যথা,- পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু। এগুলো এদের লক্ষণ এবং কর্ম অনুসারে পরিচিত। এদের প্রত্যেকের লক্ষণ এবং কৃত্য ভিন্ন ভিন্ন। পৃথিবীর লক্ষণ খর, জলের লক্ষণ স্নেহ, অগ্নির লক্ষণ উষ্ণতা এবং বায়ুর লক্ষণ গতি। পৃথিবীর কৃত্য ধারণ করা, জলের কৃত্য সংগ্রহ বা সংযোগ করা, অগ্নির কৃত্য পরিপক্ব করা এবং বায়ুর কৃত্য বিস্তৃত করা বা গতি সঞ্চর করা। চার প্রকার মহাভূত উপাদারূপের শুধু জন্মান্বাদন করে ক্ষান্ত হয় না, বরঞ্চ প্রত্যেক রূপের গঠনে প্রবেশ করে। যেমন একটি বৃক্ষ:। প্রথমতঃ জল উপাদানের উপস্থিতিতে সমস্ত পরমাণু এতে একত্রিত হয়ে একটি বৃক্ষের রূপ প্রদান করে। দ্বিতীয়ত: পৃথিবী উপাদানটি একে একটি সমস্ত বা গোটা বস্তুরূপে সুদৃঢ় করে রাখে। তৃতীয়ত: অগ্নি উপাদানটি একে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে এবং চতুর্থত: বায়ু উপাদানটি একে বৃদ্ধি করণে সাহায্য করে। এভাবে রূপসমূহের গঠনে চতুর্মহাভূত প্রবেশ করে থাকে। শুধু রূপে নহে, চতুর্মহাভূত গঠনেও প্রবেশ করে। যেমন, যাকে আমরা পৃথিবীধাতু বলি, সেই পৃথিবীধাতুতেও চতুর্মহাভূত বিদ্যমান। কেবলমাত্র পৃথিবীধাতুর আধিক্যের কারণে পৃথিবীধাতু পরিচিতি লাভ করে। অনুরূপভাবে অপধাতুতেও চতুর্মহাভূত বিদ্যমান। শুধু জলের আধিক্যের কারণে আপধাতু নামে কথিত হয়। এভাবে তেজধাতু ও বায়ুধাতু জ্ঞাতব্য। অভিধর্মোচতুর্মহাভূত প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসাবেও আখ্যাপ্রাপ্ত হয়েছে।

সর্বাস্তিত্ববাদ এর মতে পরমার্থ বিশ্লেষণে একাদশ প্রকার রূপ ধর্ম নিম্নরূপঃ

১। ইন্দ্রিয়রূপ : চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহবা, কায়।

২। আলম্বনরূপ : রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্প্রষ্টব্য।

৩। বিজ্ঞপ্তিরূপ

উপরোক্ত একাদশ প্রকার রূপধর্মে চৌদ্দ প্রকার পরমাণু বিদ্যমান। সেগুলো হচ্ছেঃ পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় রূপ, আলম্বনরূপ পাঁচ প্রকার এবং চার প্রকার ভূতরূপ (পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু)। ইন্দ্রিয়রূপের ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে অণু। তা আট প্রকার পরমাণুর দ্বারা গঠিত। আট প্রকার পরমাণু হচ্ছেঃ চার প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আলম্বনরূপ পরমাণু (বর্ণ, গন্ধ, রস, ওজ) এবং চার প্রকার উপাদানীয় পরমাণু (পৃথিবী, আপ, তেজ, বায়ু)। এতদসঙ্গে শব্দ পরমাণু যুক্ত হয়ে সংখ্যায় নয় (৯) হয়ে থাকে। নিদিষ্ট ইন্দ্রিয়ের পরমাণু যেমন, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের বেলায় চক্ষু ইন্দ্রিয় পরমাণু যোগ করলে সংখ্যায় দশ হয়ে থাকে। আর যখন স্প্রষ্টব্য পরমাণু গৃহীত হয় তখন সংখ্যা দাঁড়ায় একাদশ। এভাবে গঠনকারীর অণুর পরমাণু বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য চার প্রকার মহাভৌতিক পরমাণু প্রত্যেক উপাদা পরমাণুর আশ্রয়স্থল বা অবলম্বন। অ-ইন্দ্রিয়রূপের ক্ষুদ্রতম অংশের অণু অষ্ট (৮) পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এসব অণু বিভিন্ন ধরনের। যখন মহাভৌতিক পরমাণু উপাদা পরমাণুর পক্ষ সমর্থন করে এদের সংখ্যা বিশেষ (২০) গিয়ে পৌঁছে। এভাবে পরমাণুর ক্রমিক শক্তি বৃদ্ধিতে হবে।

পরমাণুর লক্ষণ

পরমাণুই রূপের চরম ক্ষুদ্রতম অংশ। রূপকে বিশ্লেষণ বা বিভাগ করতে করতে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে অবস্থায় পৌঁছলে রূপকে আর বিভাগ করা সম্ভব নয়। রূপের এই অবস্থাকে পরমাণু বলে। রূপের এরূপ একই ধারণা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্ব নীতিধর্মে পাওয়া যায়। কোন কোন বিষয়ে মতভেদ থাকলেও সকলেই স্বীকার করেন রূপের চরম ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু নিত্য লক্ষণ বিশিষ্ট।

কিন্তু বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বিশ্বাস করেন জগতের সমস্ত উৎপন্ন পদার্থের ন্যায় রূপের ক্ষুদ্রতম অংশও অনিত্য। এখানে উল্লেখ্য, বৌদ্ধ দার্শনিকের মতে সকল প্রকার সংস্কৃত ধর্ম বা কার্য- কারণে উৎপন্ন ধর্ম অনিত্য লক্ষণ বিশিষ্ট। তাই পরমাণুও ঐপ্রকার ধর্ম থেকে বাদ পড়ে না।

থেরবাদ ও সর্বাস্তিবাদ ধর্মীয় সাহিত্যে পরমাণুর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। বিশেষ করে অভিধর্ম সাহিত্যেও উল্লেখ নেই। সর্বাস্তিবাদ অভিধর্মের মহাটীকা বিভাষাশাস্ত্রে এর প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। কোন কোন দার্শনিকের মতে ইহা বৈশেষিক শাস্ত্র থেকে ধার করা হয়েছে। এই বিষয়ে বৈশেষিক শাস্ত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, বৌদ্ধ দার্শনিকেরা এর গুরুত্ব অনুধাবন করে মূল ধর্মের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে উক্ত নীতিসমূহ অভিধর্মে সংযোজন করেছেন।

ইন্দ্রিয় :

প্রথম পঞ্চ ইন্দ্রিয় উপাদা রূপকে বুঝায়। ইন্দ্রিয়সমূহ স্থূল রূপ নয়। এগুলোকে সুক্ষ্ম রূপ বা প্রসাদরূপ বলে। বিষয়সমূহ জানে এই অর্থে এগুলোকে ইন্দ্রিয় বলে। যেমন,- চক্ষু ইন্দ্রিয় বা চক্ষু চক্ষুগোলক নয়। এটি একটি সুক্ষ্ম ইন্দ্রিয় যা রূপায়তন বা দৃশ্যমান বিষয়সমূহকে দেখে বা জানে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই সুক্ষ্ম ইন্দ্রিয়কে দৃষ্টিশিরা বলে। যখন তা বিনষ্ট হয়, তখন দৃষ্টি শক্তি বিনষ্ট হয়েছে বলে বুঝতে হবে। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দুটি অংশ। একটি হচ্ছে মূল অংশ (সুক্ষ্ম ইন্দ্রিয়) এবং অপরটি সাহায্যকারী অংশ (চক্ষু গোলক)। এভাবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহকে জানতে হবে।

ইন্দ্রিয়ের আকার এবং গঠন

থেরবাদ এবং সর্বাস্তিবাদ এর মতে ইন্দ্রিয়ের আকার ও গঠন নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ

চক্ষু ইন্দ্রিয় : থেরবাদ এর মতে চক্ষু ইন্দ্রিয় ক্ষুদ্র এবং মোলায়েম লক্ষণ বিশিষ্ট। চক্ষু ইন্দ্রিয়কে উকুনের মস্তকের আকারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের পরমাণু

গঠন সম্পর্কে আচার্য বসুবন্ধু বলেন যেমন,- ময়দার গুড়া জলের উপরে ছিটিয়ে দিলে জলের উপরিভাগে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি চক্ষু ইন্দ্রিয় গঠনকারী অণু চক্ষুর তারার উপরিভাগে ছড়িয়ে থাকে।

শ্রোত্র ইন্দ্রিয় : আচার্য বুদ্ধঘোষ বলেন শ্রোত্র ইন্দ্রিয়ের এককসমূহ (Units) কর্ণের ছিদ্রের মধ্যে অবস্থিত এবং তা পাঁচটি লালবর্ণের কেশের দ্বারা সুসজ্জিত। এগুলো আকারে আংটির দ্বারা আবৃত অঙ্গুলির ন্যায়। অপর পক্ষে, আচার্য বসুবন্ধু এগুলোকে পেঁচ দিয়ে আঁটা চেঁরী বৃক্ষের বাকলের সাথে তুলনা করেছেন, যা বৃক্ষের গুড়ি থেকে অসংলগ্ন হওয়া মাত্রই গুটিয়ে যায়।

ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় : এসব অণু-পরমাণু নাসারন্ধ্রের মধ্যে অবস্থিত এবং আকারে অজের খুড়ের ন্যায়। বসুবন্ধু বলেন এটি থাবার ন্যায় এবং নিম্নদিকে সতত মুখ করা।

জিহ্বা ইন্দ্রিয় : বুদ্ধঘোষ আচার্যের মতে জিহ্বা ইন্দ্রিয়ের পরমাণু জিহ্বার মধ্যভাগে অবস্থিত এবং আকারে পদ্ম পাতার উপরি অংশের ন্যায়। বসুবন্ধুর মতে এগুলো আকারে অর্ধ চন্দ্রের ন্যায়।

কায় ইন্দ্রিয় : থেরবাদ এবং সর্বাস্তিবাদ এর মতে এই ইন্দ্রিয়ের পরমাণুসমূহ সমস্ত শরীরে ব্যপ্ত থাকে। কেবলমাত্র পার্থক্য এই সর্বাস্তিবাদ এর মতে শরীরের প্রত্যেক পরমাণু কমপক্ষে একটি স্পষ্টব্যা পরমাণু ধারণ করে থাকে।

ইন্দ্রিয়ের শক্তি :

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু ইন্দ্রিয় এবং শ্রোত্র ইন্দ্রিয় অপর তিনটি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। চক্ষু ইন্দ্রিয় দশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত এর বিষয়বস্তু দেখে থাকে। শ্রোত্র ইন্দ্রিয় অনেক দূরে উৎপন্ন শব্দ শুনতে পায়। ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়, জিহ্বা ইন্দ্রিয় এবং কায় ইন্দ্রিয় এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়বস্তু যখন এদের সংস্পর্শে আসে, তখনই উক্ত ইন্দ্রিয় সমূহ জানে। অন্য অর্থে, যখন এদের বিষয় বস্তু দূরে অবস্থান করে তখন এগুলো জানে না। আবার এগুলো শক্তিতে নানারূপ। ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় এর বিষয়বস্তু শীঘ্র জানতে পারে। পক্ষান্তরে, কায় ইন্দ্রিয়ে তুলনামূলকভাবে ধীর। জিহ্বা ইন্দ্রিয় মধ্য স্থান অধিকার করে আছে।

ইন্দ্রিয় সমূহের উত্তরকারী লক্ষণঃ

(Responsive nature of Indriyas)

সর্বাঙ্গিবাদ এর মতে চক্ষু ইন্দ্রিয় এবং শ্রোত্র ইন্দ্রিয় পরমাণুর প্রতি নজর না দিয়ে তাদের স্বীয় বিষয়সমূহ বুঝতে ও জানতে পারে।

চক্ষু ইন্দ্রিয় অতি আকার বিশিষ্ট পর্বত এবং চক্ষু প্রমাণ আসুর ফলও দেখে থাকে। শ্রোত্র ইন্দ্রিয় বজ্রের নিনাদ এবং মধুকরের গুণ গুণ শব্দও শুনে থাকে। অবশিষ্ট তিনটি ইন্দ্রিয় তাদের নিজ সমান সংখ্যক বস্তুগত পরমাণু জেনে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় দশ পরমাণুর দ্বারা গঠিত এবং এর বিষয়বস্তু একশত পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এই ক্ষেত্রে ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় এক এক বার এর বিষয়বস্তুর দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র জানতে পারে। তাই সমস্ত বিষয় গ্রহণ বা জানতে ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের দশগুণ সময় লাগে। কিন্তু এর কৃত্য এত দ্রুত যে, সেই বিষয়বস্তু বোধকরণে কোন লোক মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে পৃথকতা জানতে পারে না। অপর দুটি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এরূপ জ্ঞাতব্য।

অপরপক্ষে, মন ইন্দ্রিয় বিষয়বস্তু জানার সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি নিম্নতম চিত্তভূমি থেকে উচ্চতম চিত্তভূমি পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করে থাকে।

ইন্দ্রিয়গ্রহণ বিষয়

রূপায়তনঃ বৈভাষিক এর মতে চরম বিশ্লেষণে রূপায়তন অনেক প্রকার সংস্থান বা আকার এবং বর্ণের পর্যায়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সংস্থানরূপ আট প্রকার। যথা,- দীর্ঘ, হ্রস্ব, বৃত্ত, পরিমন্ডল, উন্নত, অবনত, সমতল, অসমতল। বর্ণ দ্বাদশ প্রকার। যথা,- নীলবর্ণ, পীত বা হলুদবর্ণ, অবদাত বা শ্বেত বর্ণ, কাল বর্ণ, ধূমবর্ণ, কুয়াসাবর্ণ, ছায়াবর্ণ, আতপ বা সূর্য বর্ণ, আলোক বা চন্দ্রবর্ণ, অন্ধকারবর্ণ। সংস্থান এবং বর্ণ বিবেচনা করে সমস্ত রূপায়তন বিংশতি লক্ষণ বিশিষ্ট বলা যেতে পারে।

বৈভাষিকদের প্রদত্ত রূপায়তনের বিশ্লেষণ থেরবাদ এ প্রদত্ত বিশ্লেষণ কমবেশী একই প্রকার। এখানে উল্লেখ্য, সৌত্রান্তিকেরা সংস্থান রূপের উপরোক্ত সত্যতা স্বীকার করেন না।

শব্দায়তন : শব্দ আট প্রকার। প্রথম পর্যায়ে শব্দ দুটি মুখ্য বিভাগে বিভক্ত। (১) উপাত্য মহাভূত হেতুকাঃ- জ্ঞানবিশিষ্ট সত্ত্বগুণের দ্বারা উৎপন্ন শব্দ। অন্য অর্থে, এগুলো ইন্দ্রিয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। উদাহরণস্বরূপ- হাতের তালির দ্বারা উৎপন্ন শব্দ এই শ্রেণীর

অন্তর্গত। (২) অনুপাত্য মহাভূত হেতুকাঃ-জড় বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন শব্দ। উদাহরণস্বরূপ - বায়ুর দ্বারা উৎপন্ন শৌ শৌ শব্দ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এগুলো পুনঃ অপর দুভাগে বিভক্ত। (১) সত্যাত্মা - স্পষ্ট শব্দ, (২) অসত্যাত্মা - অস্পষ্ট শব্দ। মানুষের দ্বারা কৃত শব্দ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত এবং গ্রামফোনের দ্বারা কৃত শব্দ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

তৃতীয় পর্যায়ে শব্দ পুনরায় দুভাগে বিভক্ত। মনোজ্ঞ শব্দ এবং অমনোজ্ঞ শব্দ। মনোজ্ঞ এবং অমনোজ্ঞ শব্দ ভেদে উপরোক্ত চার প্রকার শব্দ আট প্রকার হয়ে থাকে।

গন্ধায়তন : গন্ধ চার প্রকার। যথা,- সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, সমগন্ধ (যা শরীরের উপকারী), বিসমগন্ধ (যা শরীরের অনিষ্টকারী)।

রসায়তন : রস ছয় প্রকার। যথা : মুখুর, অম্ল, লবন, কটু, তিক্ত, ধারক, (কষা)।

স্প্রষ্টব্য : স্প্রষ্টব্য একাদশ প্রকার। যথা,- পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, মৃদুতা, কর্কশতা, লঘুতা, গুরুতা (ভারী), শীত, ক্ষুধা, পিপাসা।

প্রথম পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং তাদের স্ব স্ব বিষয়বস্তু দশ প্রকার রূপধর্ম গঠন করে। অবিজ্ঞপ্তিরূপ সহ সর্বাঙ্গিবাদী পরমার্থ ধর্মের তালিকায় এগুলো একাদশ প্রকার। স্প্রষ্টব্য ব্যতীত দশ প্রকার রূপধর্মকে ভৌতিকরূপ বলে। স্প্রষ্টব্যকে ভূতভৌতিক রূপ বলে।

খেরবাদ এর রূপধর্মে ফস্‌সো বা স্পর্শ পৃথক শ্রেণীতে সংগৃহীত হয়নি। কেননা, এটি পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু এই তিনটি মহাভূত এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় (আপধাতু বর্জিত ভূতত্রয় নামক স্প্রষ্টব্য)। জল বা আপ শীতলতা বা আদ্রতা অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি উষ্ণতার বিপরীত। উষ্ণতা অধিক এবং কম তাপমাত্রা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এগুলো তেজ ধাতুর দুই প্রকার স্বরূপের জন্য বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে জল বা আপধাতু স্প্রষ্টব্যে বিবেচিত হয়নি।

মন বা বিজ্ঞান

(Mind or Consciousness)

বুদ্ধদর্শনে আত্মার ন্যায় কোন স্থায়ী বাস্তব পদার্থ নেই। বুদ্ধদর্শনে 'অনাত্মা' দ্বারা 'আত্মা' শব্দকে খন্ডন করা হয়েছে। এই দর্শনে মানসিক (অজড়) এবং জড় অবস্থার কথা উল্লেখ

আছে। পালি পরিভাষায় এই দুই অবস্থাকে 'নামরূপ' বলা হয়ে থাকে। এই নামরূপ অনিত্য লক্ষণ বিশিষ্ট। নামরূপকে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়।

পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান। রূপকে রূপস্কন্ধ বলে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে অরূপস্কন্ধ বলে। রূপ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এই তিনটি স্কন্ধ চৈতসিকের অন্তর্গত। এখানে চৈতসিকের আলোচনা নিম্নপ্রয়োজন।

থেরবাদ এবং সর্বাস্তিবাদ অনুসারে বিজ্ঞানকে মন, চিত্ত বলা হয়েছে। তাই মন, চিত্ত, বিজ্ঞান একার্থবোধক বলা যেতে পারে। আচার্য বসুবন্ধু মনকে চিত্ত বলেছেন। কেননা, ইহা চিন্তা করে, বিবেচনা করে অর্থে চিত্ত বলেছেন; প্রভেদ জ্ঞাপন করে বা বিশেষভাবে জানে এই অর্থে বিজ্ঞান বলেছেন। এই তিনটির মধ্যে অর্থগত কিছু কিছু প্রভেদ থাকলেও এগুলো কিন্তু একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাচীন পালি সাহিত্যে প্রায়ই বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধর্মে 'চিত্ত' শব্দটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছে। আর মন শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মনন করে অর্থে 'মন' বুঝায়।

ছয় প্রকার বিজ্ঞান

বিভিন্ন বাস্তব (Base) হিসেবে মনকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : চক্ষু বিজ্ঞান, শ্রোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান, কায় বিজ্ঞান, মনো বিজ্ঞান। এই সকল বিজ্ঞান স্ব স্ব ইন্দ্রিয় এবং এদের বিষয় বস্তুর প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকে। যেমন, - চক্ষুং চ পটিচচ রূপে চ উপ্পজ্জতি চক্খুবিঞ্ঞাণং। ইন্দ্রিয় এবং বিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিবেচনা করে শেষোক্তটি পূর্বোক্তটির নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, - চক্ষুবিজ্ঞান চক্ষুর নামানুসারে হয়েছে।

প্রথম পঞ্চ বিজ্ঞানের বাস্তব হল যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ। কিন্তু মনোধাতুই হল মনোবিজ্ঞানের বাস্তব। সর্বাস্তিবাদ এর মতে মনোধাতু পৃথক বিজ্ঞান নয়। একটি চিত্তসত্ত্বতির পূর্ববর্তী চিত্তক্ষণ মাত্র।

ছয় প্রকার বিজ্ঞানের মধ্যে প্রথম পঞ্চ বিজ্ঞান কেবলমাত্র তাদের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তু জানতে পারে। কিন্তু মনোবিজ্ঞান ব্যাহিক এবং আভ্যন্তরিক উভয় বিষয়বস্তু জানতে পারে। অন্য কথায়, মনোবিজ্ঞান স্বীয় বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত প্রথম পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়বস্তু জানতে পারে। তাই, প্রথম পঞ্চ বিজ্ঞানের দ্বিত্ব বাস্তব আছে বলতে হবে।

সর্বাস্তিবাদীরা তিন প্রকার বিকল্প (discrimination) এর কথা বলেন। সেগুলো হচ্ছেঃ স্বভাব বিকল্প, নিরূপন বিকল্প, অনুস্মরণ বিকল্প।

স্বভাব বিকল্প হচ্ছে স্বাভাবিক বিকল্প। এটি প্রথম পঞ্চ বিজ্ঞানের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। তাই, এটি প্রাথমিক লক্ষণ বিশিষ্ট এবং কেবলমাত্র বর্তমান বিষয়সমূহে সীমাবদ্ধ।

নিরূপন বিকল্প আনুমানিক জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিষয়সমূহের সাথে সম্বন্ধ রেখে মনোবিজ্ঞানের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

অনুস্মরণ বিকল্পকে স্মৃতি বিকল্প (Retrospective discrimination) বলে। অতীত বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

প্রথম বিকল্প বিজ্ঞানের গ্রহণক্ষম লক্ষণকে বুঝায়। অপর দুটি বিকল্প বিজ্ঞানের কর্মক্ষম লক্ষণকে বুঝায়। অর্থাৎ স্বভাব বিকল্পকে এভাবে বুঝতে হবে যে, প্রথম পঞ্চ বিজ্ঞান শুধু বিষয়বস্তু গ্রহণ করে। অপর দুটি বিকল্প বিষয়বস্তু সমূহ পর্যবেক্ষণ করে এবং মন্তব্য প্রকাশ করে। অন্য কথায়, মনো বিজ্ঞানে গৃহীত অপর দুটি বিকল্প বুদ্ধিমত্তার কাজ সম্পাদন করে থাকে।

থেরবাদ অনুসারে প্রথম পর্যায়ে চিত্ত স্ব স্ব বাস্তু হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। দুটি নীতি হিসেবে চিত্ত যথাক্রমে উননব্বই প্রকার বা একশ একুশ প্রকারে বিশ্লেষিত হয়েছে। বিভাগের প্রথম নীতি চিত্তভূমির উপর নির্ভরশীল। চিত্তভূমি চার প্রকার। যথা,- কামভূমি, রূপভূমি, অরূপভূমি, অপরিয়াপন্নভূমি (যা প্রথম তিন ভূমির অন্তর্গত নয়)।

প্রথম তিনভূমি একত্রে লৌকিক ভূমি নামে পরিচিত। অপরটি লোকোত্তর ভূমি নামে কথিত। ভূমি অনুসারে চিত্ত সমূহের নামকরণ হয়েছে। যেমন,- কামভূমির চিত্তকে কামাবচর চিত্ত, রূপভূমির চিত্তকে রূপাবচর চিত্ত, অরূপভূমির চিত্তকে অরূপাবচর চিত্ত এবং অপরিয়াপন্নভূমির চিত্তকে লোকোত্তর চিত্ত বলে। প্রথমতঃ এগুলোকে কুশল, অকুশল এবং অব্যাকৃত হিসেবে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এগুলোকে বিপাক এবং ক্রিয়া হিসাবে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু সর্বাস্তিবাদ- এ চিত্তের এই প্রকার বিভাগ দেখা যায় না।

থেরবাদ অনুসারে হৃদয় হচ্ছে চিত্তের বাস্তু। সেই হিসাবে উক্তবাদে মনোধাতু বলতে পঞ্চদ্বারাবর্তন এবং দুই প্রকার সম্প্রতীচ্ছ চিত্তকে বুঝায়।

চি্ত্ত বিপ্রযুক্ত ধর্ম (সংস্কার)

বিপ্রযুক্ত সংস্কার চৌদ্দ প্রকারঃ

- ১। প্রাপ্তি-ইহা এক প্রকার শক্তি যা জীবন সন্ততিতে মহাভূতের সংগ্রাহক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- ২। অপ্রাপ্তি-ইহা এক প্রকার শক্তি যা জীবন সন্ততিতে মহাভূত সংরক্ষণ করে।
- ৩। নিকায় সভাগতা-ইহা এক প্রকার শক্তি যা জীবের অংগ-প্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক নিয়মে উৎপন্ন করে।
- ৪। অসজ্জীক সমাধি-ইহা এক প্রকার শক্তি যা পুদ্গলকে অসজ্জীক সমাধিতে পরিণত করে।
- ৫। অসজ্জীক সমাপত্তি-ইহা এক প্রকার বিজ্ঞান নিরোধক শক্তি এবং কোন প্রকার মনসিকার ব্যতীত ধ্যান উৎপন্ন করে।
- ৬। নিরোধ সমাপত্তি-ইহা এক প্রকার বিজ্ঞানের চেতনা উৎপন্ন করার শক্তি এবং উচ্চ ধ্যান উৎপন্ন করে।
- ৭। জীবিত-জীবনী শক্তি।
- ৮। জাতি-জন্ম।
- ৯। স্থিতি-স্থিতি বা অবস্থিতি(সন্ততি বা জীবন প্রবাহ)।
- ১০। জরা-জরা বা বার্দ্রক্য।
- ১১। অনিত্যতা-অনিত্যতা।
- ১২। নামকায়-যে শক্তি অভিপ্রায় ব্যক্ত করে।
- ১৩। পদকায়-যে শক্তি দ্বারা সুস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা যায়।
- ১৪। সুস্পষ্ট শব্দে শক্তি প্রয়োগ।

অসংস্কৃত ধর্ম

সর্বাঙ্গবাদ-এ অসংস্কৃত ধর্ম তিন প্রকার। যথা,- আকাশ, প্রতিসংখ্যা নিরোধ এবং অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ। অসংস্কৃত ধর্ম সম্বন্ধে পূর্বে ব্যাখ্যা হয়েছে। এখানে নিঃপ্রয়োজন।
 থেরবাদ-এ অসংস্কৃত ধর্ম একটি। নির্বাণকে অসংস্কৃত ধর্ম বলে।

চতুর্থ অধ্যায় নির্বাণ

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণে লোকোত্তর চার মার্গ ও চার ফলের দ্বারা নির্বাণ সাক্ষাত বা প্রত্যক্ষ করতে হয়। মার্গ ও ফলকে আলম্বন করে বান (পালি) বা তৃষ্ণা থেকে নিষ্ক্রমণকে নির্বাণ বলে। ইহা স্বভাবভেদে একপ্রকার। কারণ পর্যায়ে, সউপাদিশেষ নির্বাণধাতু এবং অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু এই দু প্রকার হয়ে থাকে। আকারভেদে, শূন্য, অনিমিত্ত, অপ্রাণিহিত (অপ্পণিহিতং)- এই তিন প্রকার হয়ে থাকে।

সুগত শাসনে সম্যক প্রতিপন্ন আর্য পুংগলদের নির্বাণ লাভই পরম লাভ বলে কথিত হয়েছে। সংসার সমুদ্র থেকে উত্তরণের জন্য ভগবান বুদ্ধ সকল প্রাণীদের জন্য এই অমৃতপদ প্রচার করেছেন। নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার থেকে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হন। প্রব্রজিত হয়ে তারা শীল পালন করেন, সমাধি ভাবনা করেন ও প্রজ্ঞার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার পরিশুদ্ধতায় প্রজ্ঞার দ্বারা তাঁরা নির্বাণ সাক্ষাত করেন এবং অমিশ্র পরম সুখ অনুভব করেন (অমিস্সং পরমং সুখং অনুভবন্তি)।

ভগবান কর্তৃক উক্ত হয়েছে মহাসমুদ্র এক রস বিশিষ্ট। সেটা হচ্ছেঃ লবণরস বা লবণাক্ত। সেরূপ ভগবান বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় একরস বিশিষ্ট। সেটা হচ্ছে ঃ বিমুক্তিরস। গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীসমূহ যেমন উৎসস্থান থেকে নির্গত হয়ে বিভিন্ন স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়, সেরূপ ভগবানের প্রজ্ঞাপ্ত প্রতিপদা(পাঃ পটিপদা) নির্বাণমুখী। ভগবানের শাসনে যারা ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তাঁরাও নির্বাণ পরায়ণ। নির্বান প্রাপ্ত হয়ে দুঃখের অন্তসাধন করেন।

ত্রিপিটক গ্রন্থে এবং অর্থ কথায় নির্বাণ শব্দের অর্থ বিভিন্ন প্রকারে দেখা যায়। এখানে ‘নি’ উপসর্গ নেই, অভাব, নিষেধ (পাঃনিষেধ) প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘বান’ অর্থে তৃষ্ণা বা ইচ্ছার অধিবচনকে বুঝায়। তাই বান বা তৃষ্ণা থেকে নিষ্ক্রমণই নির্বাণ নামে কথিত। অপর অর্থে, তৃষ্ণার ক্ষয়কে নির্বাণ বলা হয়ে থাকে। পুনরায়, পুনঃপুনঃ প্রতিসন্ধি গ্রহণ, কটু বেদনা উপলব্ধি ও মৃত্যুমুখে পতনকে সংসার এবং পঞ্চ উপাদান স্কন্ধকে গভীর বন বলা হয়েছে। সংসার এবং পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের নিরোধের নামই নির্বাণ উক্ত হয়েছে।

মহাকারুণিক বুদ্ধ লোভ, দ্বেষ, মোহ- এই ত্রিবিধ অগ্নির দ্বারা দাহ্যমান সকল প্রাণীর প্রতি করুণা পরবশ হয়ে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায়- এই

চার আর্থ সত্য প্রকাশ করেছেন। এখানে ‘দুঃখের নিরোধ’ এই আর্থ সত্যকে নির্বাণ বলা হয়েছে। নির্বাণই সত্য, নির্বাণই সুখ, নির্বাণই পণীতং (পালি) এই কথা বলে দুঃখের অন্ত সাধনের জন্য স্বাখ্যাত ধর্ম বিনয়ে ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য ভগবান বুদ্ধ সীংহনাদ করেছিলেন। নির্বাণের স্বরূপ অপ্রতিভাগ (পাঃ অপ্পটিভাগ) বলা হয়েছে। পুনরায়, ত্রিপিটক গ্রন্থে নির্বাণের স্বরূপ কখনো কখনো ভাবরূপে, কখনো কখনো অভাবরূপে, কখনো কখনো অনির্বচনীয়-রূপে বর্ণিত হয়েছে।

নির্বাণ ধাতু সম্বন্ধে বলতে যেয়ে নির্বাণকে পরম সুখ, অমৃতপদ, অচ্যুতপদ, অনুত্তর যোগক্ষেম, সুরক্ষিত দ্বীপ, অভয়স্থান বলা হয়েছে। এখানে পরম সুখ বলতে লোকোত্তর সুখকে বলা হয়েছে। এই সুখ লৌকিক সুখ থেকে শ্রেষ্ঠতর। আরোগ্যং পরমং লাভং, নিব্বানং পরমং সুখং, সুসুখং বত নিব্বানং সম্মাসম্বুদ্ধ-দেসিতং-এগুলো বাক্যের দ্বারা নির্বাণের সুখস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ সম্যক সম্বুদ্ধ হয়ে সাত সপ্তাহ বিমুক্তির সুখ অনুভব করেছিলেন। ‘রাজ্য সুখ থেকে বিমুক্তি সুখ শ্রেষ্ঠ এই অর্থে মগধরাজ বিম্বিসার ভগবানকে সুখ-বিহারী (নির্বাণ বিহারী) বলেছেন। তাই বলা হয়েছে, নির্বাণই পরম সুখ। জগতে এমন কোন বস্তু নেই যাতে এরূপ শ্রেষ্ঠ সুখ অনুভব করা যায়।

অমৃতপদ বলতে নির্বাণকে বলা হয়েছে। অমৃতই সেই পদ যেখানে জাতি, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু নেই। এসব বুঝাতে যেয়ে ত্রিপিটক গ্রন্থের অনেক স্থানে ‘অমতং অধিগতং,’ ‘ফুস্‌সিং অমতপদং’ ইত্যাদি উক্ত আছে।

অচ্যুতপদ বলতে চ্যুতি বিপ্রযুক্ত, পতন বিরহিত, পুনঃপুনঃ ভবচক্রে উৎপত্তির অভাব ইত্যাদি অর্থে নির্বাণকে অচ্যুতপদ বলা হয়েছে।

পুনরায়, নির্বাণকে গতি, স্থিতি, চ্যুতি, উৎপত্তি রহিত অনালম্বন বলা হয়েছে। অকিঞ্চণ, অনাদান প্রভৃতি অর্থেও নির্বাণ সুরক্ষিত দ্বীপ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়মূহের দ্বারা নির্বাণকে ভাবরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে।

অভাব অর্থে, নির্বাণকে নিরোধ, ক্ষয় প্রভৃতি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে নিরোধ অর্থে দুঃখক্ষণের নিরোধ বুঝাতে হবে। নির্বাণকে অনির্বচনীয় বা অকথনীয় বলতে যেয়ে উক্ত হয়েছে যেমন, অগ্নি নির্বাণিত হলে অগ্নি শিখা কোথায় গেল, তা বলা যেমন সম্ভব নয়, অনুরূপভাবে, পরিনির্বাণগতের গতি অনির্বচনীয় বা অকথনীয়।

খেরবাদ পরম্পরায় পরমার্থ ধর্ম নির্বাণ সংখ্যায় এক উক্ত হয়েছে। নির্বাণকে উদয়-ব্যয় রহিত অসংখ্যত (অসংস্কৃত) বলা হয়েছে। ক্ষয় অর্থে নির্বাণ ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখানে ‘ক্ষয়’ শব্দের দ্বারা রাগাদি ক্লেশসমূহের ক্ষয় বুঝানো হয়েছে। পুনরায়, নির্বাণকে ন উপ্পন্নং ন

উপাদানিয়, এবং সকল প্রকার পাপরহিত অনুত্তর, পণীতং নিরুপদ্রব, অভয়, ক্ষেম, শান্ত, সুখ, (pleasant) সূচী, শীতল প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে এরূপ স্বভাব সম্পন্ন নির্বাণকে কিভাবে জানা যায়? উত্তরে বলা যেতে পারে যোগাবচর শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার উৎকর্ষ সাধনে প্রজ্ঞার দ্বারা নির্বাণকে প্রত্যক্ষ করে কেন। এই বিষয়ে সবিশেষ জানতে হলে শমথ/বিদর্শন ভাবনা করুন। আচার্য বুদ্ধঘোষ কৃত বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করুন

নির্বাণ দু প্রকার, যথা,- সউপাদিশেষ (সউপাদিসেস) ও অনুপাদিশেষ (অনুপাদিসেস)। উপাদি অর্থে পঞ্চস্কন্ধ বুঝতে হবে। স-উপাদি+সেস = সউপাদিসেস। (উপাদি এর সোসো উপাদিসেসো, তেন উপাদি সেসেন সহ বত্ততীতি সউপাদিসেসং। তেন উপাদিসেসেন বত্তমানং নিব্বানং সউপাদিসেস্ নিব্বানং। এখানে বাংলা শেষ বা পালি সেস অর্থে সমাপ্ত নয়। এখানে শেষ অর্থে অবশিষ্ট (Remaining) অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ মাত্র অবশিষ্ট আছে; পঞ্চস্কন্ধ গঠনকারী সমস্ত উপাদান বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই অবস্থায় পঞ্চস্কন্ধ তন্ত্র বিহীন গ্রামতুল্য সর্বমল শূন্য পরম পরিশুদ্ধভাবে অবস্থান করে। এই প্রকার বিমল বিজ্ঞানে যোগাবচর জানেন নির্বাণ সুখদায়ক, শান্ত, পণীতং ইত্যাদি।

উপাদির অভাবই-অনুপাদি। 'সউপাদিশেষ-নির্বাণ ধাতু' বুদ্ধের ও অর্হতের চ্যুতির পূর্বের অবস্থা। এবং 'অনুপাদিশেষ নির্বাণধাতু' চ্যুতির পরের অবস্থা। প্রথম অবস্থা ক্রেশের নির্বাণ, শেষের অবস্থা স্কন্ধের নির্বাণ।

সউপাদিশেষ ও অনুপাদিশেষ নির্বাণ বলতে :

খীণং পুরাণং নবং নখি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবম্মিৎ,
তে খীণবীজা অবিরল্লহিছন্দা,
নিব্বত্তি ধীরা যথাযং পদীপো (রতন-সুত্তং)

যাঁদের পুরাতন কর্ম (সংস্কার) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে, নতুন কর্ম উৎপন্নের হেতু নেই; পুনর্ভাবে আসক্তি নেই; যাঁদের জন্য নিরোধ হয়েছে এবং তৃষ্ণাক্ষয় হেতু পুনরায় জন্মগ্রহণে বীতস্পৃহ, সেই ধীর ব্যক্তিগণ প্রদীপের ন্যায় নির্বাণ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

অভিধর্ম পাঠে থেরবাদ এবং বৈভাষিক এর মধ্যে সামঞ্জস্য এবং অসামঞ্জস্য বিষয়গুলো :

বৈভাষিক মতে পরমার্থ ধর্ম পাঁচাত্তর প্রকার। পক্ষান্তরে থেরবাদ মতে পরমার্থ ধর্ম বায়ান্তর প্রকার।

	<u>বৈভাষিক</u>	<u>থেরবাদ</u>
চিত্ত্বধর্ম (চিত্ত্ব)	১	১
চৈতন্য ধর্ম (চৈতন্যিক)	৪৬	৫২
রূপধর্ম (রূপ)	১১	১৮
চিত্ত্ব বিপ্রযুক্ত ধর্ম	১৪	
অসংস্কৃত ধর্ম	৩	১ (নির্বাণ)
	-----	-----
	৭৫	৭২

উভয়নীতিই চিত্ত্বকে (একটি) ধর্ম বলে। কিন্তু বিশ্লেষণের দিক থেকে বৈভাষিকেরা ধাতু বিভাগের অন্তর্গত বিজ্ঞানধাতু এবং মনোধাতু হিসেবে সাত ভাগে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু থেরবাদীরা কামভূমি, রূপভূমি, অরূপভূমি এবং লোকান্তর ভূমি হিসেবে চিত্ত্বকে ভাগ করেছেন। ভূমি হিসেবে চিত্ত্ব উননব্বই প্রকার। ধ্যান হিসাবে চিত্ত্ব একশ একুশ প্রকার। সুতরাং উভয় বাদে চিত্ত্বের মধ্যেও অনেক প্রভেদ দেখা যায়।

জেনে রাখা ভাল

- ১। থেরবাদ, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক - এই তিনটিকে একত্রে থেরবাদ বলে।
- ২। সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক-এই দুটিকে একত্রে সর্বাঙ্গিবাদ বলে।
- ৩। সৌত্রান্তিকেরা সূত্রকে প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে মান্য করেন।
- ৪। বৈভাষিকেরা অভিধর্মকে প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে মানে।
- ৫। শূন্যবাদ (মাধ্যমিক) এবং বিজ্ঞানবাদ (যোগাচার)- এই দুটিকে একত্রে মহাসাংঘিক বলে।

এখানে উল্লেখ্য বুদ্ধধর্ম বর্তমানে দুটি প্রধান নিকায়ে বিভক্ত। একটি হচ্ছে থেরবাদ নিকায়, অপরটি হচ্ছে মহাসাংঘিক নিকায়। বুদ্ধধর্মে হীনযান এবং মহাযান এই দুটি শব্দের উল্লেখ ত্রিপিটকের কোথায়ও দেখা যায় না। সম্ভবতঃ বুদ্ধধর্ম বিদ্বেষীরা বুদ্ধধর্মকে খাটো করার লক্ষে দুটি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তাই বলি, থেরবাদকে হীনযান না বলে 'থেরবাদ' এবং মহাসাংঘিককে মহাযান না বলে 'মহাসাংঘিক' বলাই শ্রেয় (একান্তই কর্তব্য)।